ধর্মপল্লীভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতি
বৈশিষ্ট্য ও নীতি-আদর্শ

মৃত্যু: খ্রিস্টের পুনরুত্থানে নবজীবন

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪১ ❖ ৮ - ১৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জীবিতদের জন্য মৃতদের শিক্ষা

ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় ভ্রাতৃসংঘের যাজকদের বার্ষিক নির্জনধ্যান

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত স্টেনিস্‌লাস্‌ সুশীল রড্রিক্স
জন্ম: ৬ জানুয়ারী ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: কারণ, নাগরী মিশন।

এসেছি সবাই অতিথি হয়ে,
পৃথিবীর এই রঙ্গ মঞ্চে,
চলে যেতে হবে শূন্য হাতে,
রয়ে যাবে সব এ ধরাতে

দেখতে-দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চিরবিদায়ের এক বছর। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে। আমরা ভালবাসাভরে তোমাকে স্মরণ করি। আমাদের জন্য তুমি ছিলে সরলতা, ভালবাসা ও ধৈর্যের অফুরন্ত উৎস। তুমি আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ কর।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়-
শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডাঃ ফ্লোরেন্স নিরুপমা পান্ডে
পুত্র : রিপন রিচার্ড রড্রিক্স
ও
রেমন্ড স্টানিস রড্রিক্স
কন্যা : ঝুমকী রিটা রড্রিক্স
করাণ, নাগরী মিশন

বিজ্ঞ/২০৯/২০২০

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষণীয় সম্ভার।

✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি ✶ পানপাত্র ✶ আকর্ষণীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিঘ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ - BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেণ্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৯৮/২০২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৪১
৮ - ১৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২৪ - ৩০ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব

যেকোন উন্নয়নের জন্য সঠিক নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্বের প্রভাবে একটি পরিবার, প্রতিষ্ঠান, দেশ এমনকি বিশ্বও বদলে যেতে পারে। একজন যোগ্য নেতা ও নেতৃত্বের হাত ধরে একটি নতুন সভ্যতার শুরু হতে পারে, শুরু হতে পারে নতুন যুগের। আন্তর্জাতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন দেশ তাদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে কিছু যোগ্য নেতার সঠিক নেতৃত্বে। পাশ্চাত্যের যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালিসহ প্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের দিকে তাকালেই তা আমরা বুঝতে পারি। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশও বর্তমান সময়ে যোগ্য নেতার দক্ষ নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের দিকে। সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকুক তা আপামর জনগণ প্রত্যাশা করে। তবে একই সাথে যারা নেতৃত্বে থাকেন তাদেরও সচেতন থাকতে হয় তাদের দায়িত্ববোধ ও কর্মপরিধি নিয়ে। তাদের মনে রাখতে হয় নেতৃত্ব কোন টাইটেল বা পদ নয়, নেতৃত্ব হলো একজন মানুষের অন্যদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা। আর এ প্রভাব ও অনুপ্রেরণা হতে হবে ইতিবাচক। অনেক তথাকথিত নেতা আছে যারা অর্থ, পেশীশক্তি, ধর্মান্ধতা, সামাজিক গোঁড়ামী, এলাকাবাদ, গোষ্ঠীবাদ ও জঙ্গিবাদকে অবলম্বন করে নেতৃত্বে থাকতে চান। এ ধরণের নেতারা ভণ্ড নেতা। তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে অন্যদের ব্যবহার করে। কখনো-কখনো সাময়িক সুযোগ-সুবিধা দেয় কিন্তু নেপথ্যে থাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা। এই ভণ্ড নেতাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আমাদের খ্রিস্টান সমাজেও তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। সঠিক নেতৃত্ব দিতে হলে একজন প্রকৃত নেতার মধ্যে থাকবে বিশুদ্ধ ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়।

সময়ের সাথে-সাথে বাংলাদেশ মণ্ডলীতেও নেতৃত্বের পরিবর্তন এসেছে। একসময়কার বিদেশী নেতৃত্ব নির্ভর মণ্ডলীতে আজ স্থানীয়রা অগ্রভাগে। যাজকদের সাথে একাত্ম হয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরাও মণ্ডলীর বিভিন্ন দায়িত্বে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য তা গৌরবের ও প্রশংসার। এ গৌরব বৃদ্ধি করতে হলে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বদান বিষয়ক যথার্থ শিক্ষা ও গঠন দিতে হবে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দদের। নেতা-নেত্রী গঠনের সূতিকাগার বিভিন্ন সামাজিক সংঘ-সমিতি-সংগঠনগুলোর যথার্থ যত্ন নিতে হবে। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রিস্টভক্ত বিষয়ক কমিশন চেষ্টা করছেন খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বিষয়ে চেতনা দান করতে। তবে তৃণমূল পর্যায়ে সে ধারণাকে বিস্তৃত করতে হবে। ধর্মপল্লী ও গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন সংঘ-সমিতিতে যারা জড়িত আছেন, তাদেরকেও যথার্থ যত্নদান করা দরকার। বিভিন্ন সংঘ-সমিতি পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তারা ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পালকীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করে নেতৃত্বের দক্ষতা দেখাবেন। তাড়িয়ে দেওয়া, বহিষ্কার, ছুঁড়ে ফেলা নয় বরং সকলকে নিয়ে চলতে পারাই সুনেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজে নেতৃত্বদানে একসময় ধর্মযাজক ও শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তারা সমাজের উন্নয়নের জন্যও অনেক অবদান রেখেছেন। সময়ের বিবর্তনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে অন্যতম খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলো। তবে এগুলোর গোড়াপত্তন হয় যাজকদের হাত ধরেই। গির্জায় বা বাইরে যেকোন স্থানেই হোক না কেন, যাজকগণ খ্রিস্টভক্তদের মাঝে চেতনা দিতে কতই না চেষ্টা করেছেন। সমিতিগুলো যখন সমস্যায় পড়ে তখন যাজকগণই তা সমাধানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির উন্নতি আমাদের আনন্দ জাগায়। কিন্তু যেসব খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য কাথলিক মণ্ডলী এত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করেছেন, সেসব ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে যখন নেতৃত্বের কোন্দল, অর্থনৈতিক বিশৃংখলা বা কোন-কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং নীতিহীন কুটনীতি লক্ষ্য করা যায় তখন তা মণ্ডলীকে কষ্ট দেয়। অনেক খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতেই ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা, ভালবাসার চর্চা, মিলনের সংস্কৃতি, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, সহভাগিতা ইত্যাদি ছেড়ে দুঃখজনকভাবে এখন দেখা যাচ্ছে, টাকা-পয়সা ছড়ানো, মদ খাওয়া, স্বার্থ দ্বন্দ্ব, রাজনীতি ও সেরকম আরও অনেক কিছু। তবে এতো সব নেতিবাচক কিছুর মধ্যেও আশা হচ্ছে এখনো অনেকে আছেন যারা সত্যিই সেবা দিতে চান এবং নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত সেবা দিতে গড়তে চান। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষাতে প্রবুদ্ধ হয়ে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোও যার-যার অবস্থানে সঠিক নেতৃত্ব ও প্রকৃত নেতা গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি॥ ✝

"যিশু উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনের জন্যও যা কিছু করনি, তা আমরই প্রতি করনি।" - মথি ২৫:৪৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

হেডঃ ফাঃ চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন : ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স : ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল : cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.cccul.com,
অনলাইন নিউজঃ www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভিঃ dctvbd.com

সূত্র:সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২০/০১/৮৫৩ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)
তারিখ : ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
সময় : সকাল ১০টায়
স্থান : কালুর রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর)

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সকল প্রতিনিধিদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **০৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০টায়** কালুর রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, কালীগঞ্জ গাজীপুরে অত্র সমিতির ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯টা হতে শুরু হবে।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ-নিজ পরিচয়পত্র এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে প্রতিনিধিদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সভার কর্মসূচী :		**সময়**
০১।	(ক) উপস্থিতি গণনা। (খ) আসন গ্রহণ। (গ) জাতীয়, সমবায় ও সমিতির পতাকা উত্তোলন (জাতীয় ও সমবায় সংগীত পরিবেশন)। (ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা।	১৫ মিনিট
০২।	মৃত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন।	১০ মিনিট
০৩।	প্রেসিডেন্টের স্বাগত ভাষণ।	১৫ মিনিট
০৪।	অতিথিদের বক্তব্য।	২০ মিনিট
০৫।	৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন	৩০ মিনিট
০৬।	ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	৪০ মিনিট
০৭।	বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন	৪৫ মিনিট
০৮।	(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন (খ) প্রস্তাবিত আয় বন্টন হিসাব উপস্থাপন ও লভ্যাংশ ঘোষণা	১০ মিনিট ১০ মিনিট
০৯।	প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;	২০ মিনিট
১০।	ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	১৫ মিনিট
১১।	সুপারভাইজরি কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;	১৫ মিনিট
১২।	নতুন প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৩।	বিবিধ;	৩০ মিনিট
১৪।	ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।	১০ মিনিট

উল্লিখিত দিনে সকাল ৯টা হতে ১০টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সম্মানিত সকল প্রতিনিধিদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে–

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউলিঃ, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

তারিখ : ৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধনী-২০১৩)-এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন প্রতিনিধি সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত প্রতিনিধি সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

অনুলিপি:

১। প্রতিনিধিবৃন্দ।
২। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১১৩/২০

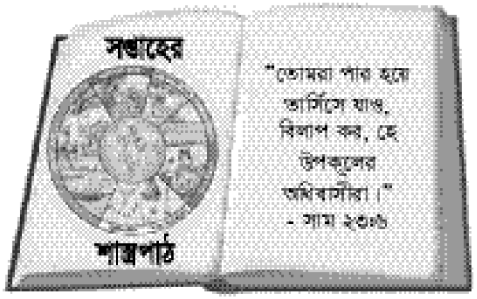

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৮ - ১৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৮ নভেম্বর, রবিবার
প্রজ্ঞা ৬: ১২-১৬, সাম ৬৩: ১-৭, ১ থেসা ৪: ১৩-১৮ (অথবা ১৩-১৪), এথি ২৫: ১-১৩

৯ নভেম্বর, সোমবার
যাত্রা ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২ অথবা ১করি ৩: ৯-১১, ১৬-১৭, সাম ৪৫: ২-৩, ৫-৬, ৮-৯, যোহন ২: ১৩-২২

১০ নভেম্বর, মঙ্গলবার
মহাপ্রাণ লিও, পোপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
তীত ২: ১-৮, ১১-১৪, সাম ৩৭: ৩-৪, ২৩, ২৭, ২৯, লুক ১৭: ৭-১০

১১ নভেম্বর, বুধবার
তুর নগরীর সাধু মার্টিন, বিশপ, স্মরণ দিবস
তীত ৩: ১-৭, সাম ২৩: ১-৬, লুক ১৭: ১১-১৯

১২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু যোসেফাত, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
ফিলেমন ৭-২০, সাম ১৪৬: ৭-১০, লুক ১৭: ২০-২৫

১৩ নভেম্বর, শুক্রবার
২ যোহন ৪-৯, সাম ১১৯: ১-২, ১০-১১, ১৭-১৮, লুক ১৭: ২৬-৩৭

১৪ নভেম্বর, শনিবার
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
৩ যোহন ৫-৮, সাম ১১২: ১-৬, লুক ১৮: ১-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৮ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৮১ সিস্টার এম হেলেন এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৭ ফাদার আন্তনিয় এলবার্টিন এসএক্স (খুলনা)

১১ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৫৭ ফাদার লিও গগিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার এম বনিফাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার আগ্নেস মিন্‌জ সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬৩ ফাদার আলফন্স মেটিভিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯১৯ সিস্টার এম ইউস্টেল অফ জিজাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৮ ফাদার লুইজি ব্রাম্বিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৩৮ ব্রাদার জন হেইম সিএসসি
+ ১৯৭১ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি (ঢাকা)

খ্রিস্টের দেহ, খ্রিস্টমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত

১২৬৯ : খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন সদস্য হয়ে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি আর নিজের থাকে না, সে হয়ে যায় তাঁরই যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন। এখন থেকে যে অপরের অধীন হতে, খ্রিস্টমণ্ডলীর মিলন বন্ধনে তাদের সেবা করতে, খ্রিস্টমণ্ডলীর নেতৃবর্গের প্রতি 'বাধ্য ও অনুগত' থাকতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করতে আহূত। দীক্ষাস্নান থেকে তারা যেমন লাভ করে দায়িত্ব ও কর্তব্য, ঠিক তেমনি দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি খ্রিস্টমণ্ডলীতে অধিকারও লাভ করে। সংস্কারগুলো গ্রহণ করার, ঐশবাণী দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ার এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর অন্যান্য আধ্যাত্মিক সহায়তা দ্বারা সংরক্ষিত থাকার অধিকার।

১২৭০ : 'ঈশ্বরের সন্তানরূপে পুনর্জাত (দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিগণ) মানুষের সাক্ষাতে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করবে' এবং ঐশজনগণের প্রৈরিতিক ও মিশনকর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের সংস্কারীয় বন্ধন

১২৭১ : সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি হল দীক্ষাস্নান, এমন কি তাদের সঙ্গে যারা কাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গে পুর্ণভাবে মিলনাবদ্ধ নয়, কারণ যেসকল মানুষ খ্রিস্টে বিশ্বাস করে এবং যথার্থভাবে দীক্ষাস্নাত হয়েছে, তারা অসম্পূর্ণ হলেও, কোন না কোনভাবে কাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গে মিলনাবদ্ধ। দীক্ষাস্নানে বিশ্বাসের গুণে ধার্মিক বলে গণ্য হওয়ায় তারা খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই খ্রিস্টান বলে আখ্যায়িত হবার অধিকার তাদের আছে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কাথলিক মণ্ডলীর সন্তানগণ কর্তৃক তারা ভাইরূপে গৃহিত। এতএব দীক্ষাস্নান ঐক্যের সংস্কারীয় বন্ধন গড়ে তোলে, যে বন্ধন দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে নবজাত সকলের মধ্যে বিরাজ করে।

এক অক্ষয় চিহ্ন

১২৭২ : দীক্ষাস্নান দ্বারা খ্রিস্টে সংযুক্ত হয়ে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি খ্রিস্টের সদৃশ হয়ে ওঠে। দীক্ষাস্নান খ্রিস্টবিশ্বাসীকে অক্ষয় আধ্যাত্মিক চিহ্নে মুদ্রাঙ্কিত করে, এই মর্মে যে সে খ্রিস্টেরই। কোন পাপই এই মুদ্রাঙ্কন মুছে ফেলতে পারে না, যদিও পাপ দীক্ষাস্নানকে পরিত্রাণে ফল ধারণে বাঁধা সৃষ্টি করে। দীক্ষাস্নান একবারই মাত্র প্রদত্ত হয়, তা পুনরায় গ্রহণ করা যায় না।

১২৭৩ : দীক্ষাস্নান দ্বারা খ্রিস্টমণ্ডলীতে সংযুক্ত হয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ সংস্কারীয় মুদ্রাঙ্কন সকল খ্রিস্টবিশ্বাসকে খ্রিস্টমণ্ডলীর পুণ্য উপাসনা-অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ঈশ্বরের সেবা করতে, এবং পবিত্র জীবন-যাপন ও কার্যত ভ্রাতৃপ্রেমের সাক্ষ্যদান দ্বারা তাদের দীক্ষাস্নানের যাজকত্বের সাধনা করতে সক্ষম ও নিবেদিত করে।

ধর্মপল্লীভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতি বৈশিষ্ট্য ও নীতি-আদর্শ

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

অবতরণিকা:

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতি হল এক প্রকার অর্থনৈতিক সমবায় সমিতি যা ব্যাংকের মত সেবা দিয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্থানের একই অবস্থা ও মনোভাবের কিছু মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা ঋণদান সমিতি গঠন করতে পারে। এই সমিতি বড়ও হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এর কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বা আকার নেই। ছোট-ছোট ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মপল্লীগুলিতে এভাবেই খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান (সঞ্চয়) সমিতিগুলি আরম্ভ হয়েছিল। এখনও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও আদিবাসী ধর্মপল্লীগুলির খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি সেইভাবেই চলে। তবে অনেক সদস্য নিয়ে গঠিত বৃহৎ সমবায় ও সঞ্চয় সমিতিগুলি স্বেচ্ছাসেবায় চলতে পারে না। তাই এগুলোর জন্য বেতনভুক্ত সেবাকর্মী রাখতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি ধীরে-ধীরে আকারে বড় হয়ে যাওয়াতে বেতনভুক্ত কর্মীনির্ভর হয়ে পড়ছে।

শুধু তাই নয়, ধর্মপল্লীভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলির আরও অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ধর্মপল্লীগুলিতে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপন ও প্রসার ছিল তৎকালীন মণ্ডলীর নেতৃবর্গের, অর্থাৎ বিশপগণ ও যাজকদের একটি যুগান্তকারী ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত, যার পুরোভাগে ছিলেন আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেনার ও ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি। এটা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল বলেই, অতি অল্প সময়েই তখনকার চারটি কাথলিক ধর্মপ্রদেশেই এর শিক্ষা ও প্রসারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য সব ধর্মপল্লীতে সহজেই খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপন সম্ভব হয়নি। ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপনের এই প্রক্রিয়া প্রায় সর্বত্রই অনেক উত্থান-পতন ও ভাঙ্গা-গড়া দেখেছে।

কাথলিক মণ্ডলী ও খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন:

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে ধর্মপল্লী ভিত্তিক "খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" এর জন্ম দিয়েছেন ফাদার চার্লস ইয়াং সিএসসি এবং তার সাথে সকল ফাদারগণ বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে এই ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আর গলদঘর্ম হয়েছেন। নিজেদের বা ধর্মপল্লীর টাকা-পয়সা ও সুবিধাদি ব্যবহার করে তিল-তিল করে এই ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিকে দাঁড় করিয়েছেন আর কিছু স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি, বিশেষ করে তৎকালীন স্কুল শিক্ষকদের মধ্য থেকে, কিছু অবৈতনিক সেবাকর্মী তৈরী করেছিলেন যারা এই ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিকে আগলে রেখেছিলেন যত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও। এই ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিতে সদস্য বাড়াতে ফাদারগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। গির্জায় বা বাইরে যেকোন স্থানেই হোক না কেন, তারা খ্রিস্টভক্তদের মাঝে মোটিভেশন বা চেতনা দিতে কতই না চেষ্টা করেছেন। কারো ভুলে বা তসরুফের কারণে ক্রেডিট ইউনিয়নের আমানতের টাকা পয়সা চুরি বা আত্মসাত হলেও ফাদারদেরই এর জন্য গলদঘর্ম হতে হত আর খেসারতও দিতে হত। কারণ এইসব ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যগণ সকলেই খ্রিস্টভক্ত আর তাই তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণই মণ্ডলীর একমাত্র স্বার্থ। এখানে ফাদারদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিল না, আর আজও তা নেই। বর্তমানে শহরের ও কিছু-কিছু বাঙালি এলাকায় ধর্মপল্লীগুলিতে পরিস্থিতি পাল্টে গেলেও, গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় এখনো পালক ফাদারদের সেই একই আন্তরিক ভালবাসায় পরিশ্রম করতে হচ্ছে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশে এই ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

ফাদারদের অবদান ও ভূমিকা:

শহরের এবং কিছু বাঙালি এলাকায় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি এখন অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নতি করেছে। এগুলির সদস্য বেড়েছে, আমানত বেড়েছে, সঞ্চয়-শেয়ার বেড়েছে এবং বোর্ড মেম্বারদের ক্ষমতাও বেড়েছে। খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির অফিসের পরিধি বেড়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মী সংখ্যা বেড়েছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে আদান প্রদানের কলেবর। খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির উন্নতি দেখে বেশ খুশী ও আনন্দ লাগে। কিন্তু যেসব খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য কাথলিক মণ্ডলী বা ফাদারগণ এত পরিশ্রম করেছে, ত্যাগস্বীকার করেছে, গলদঘর্ম হয়ে কষ্ট করেছে, সেইসব

ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিতে ফাদারদের অবস্থান বা অধিকার কি? যেহেতু ধর্মপল্লী বা ফাদারগণ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য নয়, তাই তাদের কোন বাস্তব অধিকার নেই। নৈতিক অধিকার যেটুকু আছে, সেটা অনেকটাই ক্রেডিট ইউনিয়নের নানা সমস্যা আর ঝামেলা ঝক্কি মিটমাট করার জন্যই। তারপরও তাদের আজ প্রায়ই শুনতে হয় "ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যাপারে ফাদার কে?" যদিও এখনো বাংলাদেশের অধিকাংশ খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি ধর্মপল্লীর জায়গায় আর এর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই অবস্থান করছে; কোন স্থানে নামমাত্র ভাড়া দিয়ে, আবার কোন স্থানে বিনা ভাড়ায়। অথচ ক্রেডিট ইউনিয়ন কিন্তু ধর্মপল্লীর পালকীয় কাঠামোর কোন অংশ নয় এবং ফাদারদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ এতে কিছুই নেই। তবু ফাদারদের স্বার্থ শুধু খ্রিস্টভক্তদের স্বার্থ রক্ষা করা, তাই তো এই ভার তাদের বইতেই হয়।

বর্তমান অবক্ষয়:

তবে এখন বড় প্রশ্ন হল খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি মণ্ডলী বা খ্রিস্টভক্তদের আদি প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে কি? নাকি তা পূরণ করতে পারছে না? এখন দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নই নেতৃত্বের কোন্দল, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বা কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং নীতিহীন কুটনীতিতে ভুগছে। ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা, ভালবাসার চর্চা, মিলনের সংস্কৃতি, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, সহভাগিতা, ইত্যাদি ছেড়ে দুঃখজনকভাবে এখন দেখা যাচ্ছে টাকা-পয়সা ছড়ানো, মদ খাওয়া, স্বার্থদ্বন্দ্ব, রাজনীতি ও সেরকম আরও অনেক কিছু এই ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিকে ভোগাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ধর্মপল্লীর ফাদারদের ভোগান্তিও। কেননা, ক্রেডিট ইউনিয়নের সব সদস্যই তাদের ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত। তাই তাদের কোন ক্ষতি বা অমঙ্গল হলে ফাদারগণ শান্তিতে থাকতে পারে না। তবে সমস্যা হল যে, ফাদারগণ যাদের স্বার্থ রক্ষা করতে এত পরিশ্রম ও গলদঘর্ম হন, ক্রেডিট ইউনিয়নের সেই সদস্যদেরই অনেকে ফাদারদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন না; এমন কি তারা ফাদারদের বিরুদ্ধাচরণও করে এবং কুৎসা রটায়। তারা বরং বিশ্বাস ও আস্থা রাখে সেই সব নেতাদের ওপর যারা তাদের ঠকায়, ব্যবহার করে, তাদের সাথে প্রতারণা করে, যারা স্বার্থান্বেষী মহল ও সমিতির টাকা তসরুফ করে, তাদেরই ওপর। এর ফলশ্রুতিতে বেশি টাকা আছে এরকম ক্রেডিট ইউনিয়নগুলিতে এখন আগের মত নির্বাচনের সময় আর ফাদারদের রাখা হয় না সমবায় বিধির দোহাই দিয়ে, যা সত্য নয়। যেহেতু ক্রেডিটের সদস্যরা এই বিষয় সচেতন নয়, তাদের মতামতকে প্রভাবিত করা সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহল বা অনৈতিক মনোভাবের নেতাদের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। আর এটাই ক্রেডিট ইউনিয়নের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশের প্রধান পথ। সব নেতাই যে খারাপ তা আমি বলছি না; তবে বর্তমান অবস্থা-বাস্তবতা দেখে মনে হচ্ছে তাদের সক্ষমতা খুবই সীমিত।

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির উদ্দেশ্য হ'ল কোন ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের, বিশেষভাবে দরিদ্রদের, ভাগ্যোন্নয়ন করা বা তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সহায়তা করা। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য জয় করার জন্য এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। তথাপি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য শুধুই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা বস্তুগত উন্নয়ন নয়। খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আসল উদ্দেশ্য হল সমবায়ী ও সমন্বিত উন্নয়ন; অর্থাৎ এর লক্ষ্য শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য জয় করা নয়, এর লক্ষ্য আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য জয় করাও। এর মূল বিষয়গুলি হল সমবায়, সঞ্চয় ও ঋণদান যার মধ্যে রয়েছে সমিতির সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে নিস্বার্থ আত্মদানের মনোভাব, সহযোগিতা, সহভাগিতা, মিলন, আনন্দ ও শান্তি। ধর্মপল্লীর আঙ্গিনায় এই খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির অবস্থান হওয়ায় সেখানে গির্জা ও পালকীয় জীবনের সঙ্গেও খ্রিস্টভক্তদের একটি সমন্বিত সম্পর্ক রেখে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। অথচ আজকাল দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির মধ্যে কত যে বিশৃংখলা, অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, অন্যায্যতা, অশান্তি ইত্যাদি তার কোন ইয়ত্তা নেই। এর ফলে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে গির্জা ও পালকীয় জীবনের কোন সমন্বয় কিছু নেই।

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য:

ধর্মপল্লী ভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক আদর্শই এগুলিকে বিশেষত্ব দান করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল: (১) খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন কোন ব্যাংক নয়, বরং এর সদস্যগণ এই সমবায় ঋণদান সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়নে সদস্য হয়ে ও টাকা জমা দিয়ে বা শেয়ার কিনে এর সমবায়ী অংশীদার হয়। তাই তারাই এই সমিতির আসল মালিক। এর ফলে সমিতির সদস্যগণ পরস্পরকে ঋণ দিতে পারে, নিজেদের জমা টাকার হিসাব দাবী করতে পারে, ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির অন্যান্য সকল প্রকার প্রোডাক্টের সেবা গ্রহণ করে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে। এখান থেকে সদস্যরা ব্যাংকের চেয়ে কম সুদে ঋণ নিতে পারে, কারণ এই টাকা তাদের নিজস্ব আর কিস্তিও সহজ। (২) খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের বা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যদের জমা টাকা লগ্নি করে যে আয় বা লাভ হবে তা থেকে সদস্যদের সমান অংশ দেওয়া বা তা সকলের কল্যাণের জন্য ও তাদের স্বার্থে তা ব্যয় করা। (৩) কোন খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির উদ্দেশ্য সদস্যদের টাকা ব্যবহার করে সংস্থার নিজে ধনী হওয়া নয়, বরং এর আসল উদ্দেশ্য হল সদস্যদের ধনী হতে সহায়তা করা। তাই ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতি নিজে কোন ব্যবসা করবে না, ব্যবসা করতে সদস্যদের সহায়তা করবে। (৪) বোর্ড সদস্যরা মালিকের মত আচরণ করবে না বরং তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক হিসাবে সদস্যদের সেবা প্রদান করবে। ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থের জন্য কাজ না করে, তাদের কাজ হল ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির মাধ্যমে এর সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করা। (৫) খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যরা শুধু টাকা-পয়সা বা বস্তুগত লাভের কথাই নয়, বরং তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিকসহ সকল প্রকার অগ্রগতির কথাও চিন্তা করবে এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ করবে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে আদান প্রদান, সহভাগিতা, সহযোগিতা, সামাজিক সংহতি, ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের মনোভাব তৈরী করাও ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান

সমিতির অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। (৬) খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির কার্যালয় ধর্মপল্লীর চত্বরে হওয়ায় খ্রিস্টভক্তগণ তাঁদের পালকীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে পাল-পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে ও গির্জায় ব্যক্তিগত প্রার্থনার সুযোগ নিতে পারে। বিশেষভাবে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা সদস্যরাই এই ঋণদান বা ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যালয়ে বেশি আসা-যাওয়া ও আদান-প্রদান করে থাকেন; আর তাই তাদের জন্য বেশি নিরাপদ ও সুবিধাজনক এই ধর্মপল্লীর চত্বর।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যদের ধরণঃ

সাধারণতঃ একই রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও গঠন, ইত্যাদি অবস্থার জনগণ একত্রে মিলিত হয়ে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতি গড়ে তুলতে পারে। সেই জন্য খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির সদস্য সকলেই খ্রিস্টান হবে এটাই স্বাভাবিক। ধনীদের এই ধরণের সমিতির মাধ্যমে টাকা জমানো এক রকম বিলাসিতা হলেও, দরিদ্রদের জন্য তাদের দারিদ্র্য জয়ের জন্য এটি একটি মোক্ষম উপায়। তাই এটাই স্বাভাবিক যে, যারা ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্য হবে তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক গঠনের দিক দিয়ে মিল থাকবে। তবে বর্তমানে যে সকল খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন রয়েছে, অন্যান্য সকল ক্রেডিট ইউনিয়নের মতই, সেগুলোতে ধনী-গরীব সকলেই একত্রে রয়েছে। তাই ধনী ও গরীবের বা উচ্চ শিক্ষিত ও কম শিক্ষিত সদস্যদের মধ্যে অনেক সময় বৈষম্য বুঝা যায় এবং ভুল বুঝাবুঝি তৈরী হয়। এই সুযোগে এক শ্রেণীর সদস্যরা অন্য শ্রেণীর ওপর প্রভাব খাটায়, ও ভুল বুঝিয়ে বিপথে নেয়। তাই ক্রেডিট ইউনিয়নের একটি বড় কাজ হল সদস্যদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা ও গঠন-প্রশিক্ষণ দেওয়া, সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরামর্শ দান করা। এই জন্যই ক্রেডিট ইউনিয়নের পরামর্শক থাকা আবশ্যক, যিনি ন্যায়পালের মতও ভূমিকা পালন করতে পারেন। একজন চ্যাপলেইন সেই কাজ করতে পারেন।

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চ্যাপলেইন থাকা আবশ্যকঃ

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতিতে আবশ্যকীয়ভাবেই একজন চ্যাপলেইন থাকা দরকার। খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন কতটুকু খ্রিস্টীয় নীতি-আদর্শ বা বাইবেলের শিক্ষা অনুসরণ করছে তা দেখা চ্যাপলেইনের কাজ। তিনি ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্য ও বোর্ড সদস্যদের মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যিশুর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিবেন, যেন তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহভাগিতা ও মিলনের সদ্ভাব বজায় থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ধর্মপল্লীভিত্তিক ক্রেডিট ইউনয়নগুলি যাজক বা ফাদারগণই স্থাপন করেছেন আর এখনো দরিদ্র ও আদিবাসী এলাকায় তাঁরাই এই ভূমিকা রেখে চলেছেন। তাই খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ভালভাবে চলুক এটা তারা আশা ও কামনা করে। তারা এর পিছনে সময় ও শ্রম দিয়ে থাকে নিস্বার্থভাবে।

কিন্তু ইতোমধ্যে যে সমস্ত খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন অনেক বড় হয়ে গেছে বা অনেক সদস্য ও টাকা হয়েছে, সেই সমস্ত ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি এখন আর কোন যাজক বা ফাদার চ্যাপলেইন চায় না; আর চাইলেও চ্যাপলেইনকে কোন নৈতিক কর্তৃত্ব বা অধিকার দেয় না। তাদের এখন কোন বোর্ড সভায় ডাকা হয় না, বা ডাকলেও শুধু প্রার্থনা করার জন্যই। চ্যাপলেইনের কাজ ও কর্তৃত্ব কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি। খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি খ্রিস্টীয় নীতি-আদর্শ মানছে কি না, সমবায়ের আইন মানছে কি না, কোন নির্দিষ্ট খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনয়নের নিজস্ব উপবিধি বা সংবিধান অন্যান্য বিধি অনুসরণ করছে কিনা, ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের স্বার্থবিরোধী কোন সিদ্ধান্ত বা কাজ হচ্ছে কি না, সেই সব দেখা-ও চ্যাপলেইনের কাজ। এর জন্য সকল খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের উপবিধি বা সংবিধানে সুস্পষ্ট ধারা সংযুক্ত হওয়া দরকার। এটা তো খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদেরই দাবী করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি এত দিনেও। খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির বোর্ড সদস্যদের এটা পছন্দ নয়, তাই তারা সমবায়ের আইন ছাড়াও নানা অজুহাত দেখান। কিন্তু সে সব শুধুই নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার বাঁধাহীন বা নিরঙ্কুশ রাখার জন্যই। যে কোন বাৎসরিক সাধারণ সভায় খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির সদস্যগণ তাদের উপবিধিতে পরিবর্তন আনতে পারে এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজন অনুসারে চ্যাপলেইনের দায়িত্ব-কর্তব্য ও নৈতিক কর্তৃত্ব সম্বলিত উপধারা সংযুক্ত করে নিতে পারে। সরকারের সমবায় আইনের এটা সাংঘর্ষিক নয় বিধায় তা অনুমোদিত হবে। এইভাবে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনয়নগুলি তাদের নিজেদের সঞ্চয় ও আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে নিতে পারে। আমাদের খ্রিস্টভক্তগণ অবশ্য এটা চান, কিন্তু তারা বুঝেন না যে, কোন নৈতিক কর্তৃত্ব ও অধিকার উপবিধিতে না থাকলে যাজক বা ফাদারগণ চ্যাপলেইন হিসাবে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত থাকলেও আইনগতভাবে কিছুই করতে পারেন না। তাছাড়া সাধারণত: যাজকগণ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য হন না; এটাও তাদের জন্য বড় বাঁধা, যার কারণে এই বিষয় তাদের অধিকার সীমিত; বলতে গেলে নাই। সেই জন্য প্রায় সময়ই শোনা যায়, 'ফাদারগণ আমাদের ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ে কথা বলেন কেন? তারা তো আমাদের ক্রেডিট ইউনয়নের কেউ না!' ফাদারদের বা চ্যাপলেইনদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হলে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে; চ্যাপলেইনকে উপযুক্ত নৈতিক অধিকারসহ দায়িত্ব দিতে হবে।

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালনা ও নির্বাচনঃ

খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন-এর মালিক খ্রিস্টান সদস্যগণই আর তা পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এই জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড বা পরিষদ থাকে, যা নির্বাচিত হয়ে থাকে সদস্যদের ভোটে। এই পরিচালনা পরিষদে বিভিন্ন উপকমিটিও থাকে। এই পরিষদ ও উপকমিটি নির্বাচনের সময় ক্রেডিট ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে এই পরিষদ ও উপকমিটির সদস্যদের নির্বাচন করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এখন একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় আর তা হলো খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির নির্বাচনের সময় প্রায়ই দলাদলি, হাঙ্গামা ও গোলযোগ হয়; আর

অনেক টাকা-পয়সাও খরচ করা হয়। যে কোন মূল্যে নির্বাচনে জিতার একটা মন মানসিকতা কাজ করে প্রায় সকল প্রার্থীর মধ্যে। আবার ব্যক্তিগত যোগ্যতার চেয়ে প্যানেলভুক্ত হয়ে নির্বাচনে জিতার জন্য প্রাণান্তকর প্রচারণা চালানো হয়। এইভাবে ধর্মপল্লীগুলিতে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে দলাদলি, বিভক্তি ও অশান্তি বাড়ছে। প্যানেল করে জাতীয় নির্বাচনের মত প্রচারণা করায় স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজে সুস্পষ্ট বিভক্তি তৈরী হয়, যা ধর্মপল্লীর জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই জন্য খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের নির্বাচন প্যানেল করে হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে ক্রেডিট ইউনয়নের সদস্যগণ সকলেই নির্বাচন করার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রাখে। ব্যক্তিগতভাবে যদি তারা উপযুক্ত ও যোগ্য হয় তাহলে সাধারণ সদস্যগণ তাদের ভোট দিবে এবং সেটাই হবে ভাল প্রক্রিয়া। এতে ক্রেডিট ইউনিয়ন সমিতিতে বা স্থানীয় খ্রিস্টান সমাজে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। নির্বাচন কমিশন হিসাবে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণই থাকতে পারেন। তবে চাইলে ধর্মপল্লীর ফাদারগণ বা অন্য কোন ধর্মপল্লীর ফাদার বা অভিজ্ঞ খ্রিস্টভক্তগণও এই কমিশনে থাকতে পারেন। সমবায় আইনে এতে কোন বাঁধা নেই। এতে ক্রেডিট ইউনিয়নের বেশি টাকা-পয়সাও খরচ হবে না। তবে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় টাকা খরচ করে সমবায় দপ্তরের কর্মকর্তা ও বাইরের অখ্রিস্টান প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন কমিশনার করা হয়। এটা স্পষ্ট যে এইভাবে স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়; আর তা করতে গিয়ে সমিতির সদস্যদের ভুল বুঝায়। সমিতির সদস্যদের এই ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ থাকা আবশ্যক। কারণ ক্রেডিট ইউনিয়নের টাকা তাদের নিজেদেরই টাকা। এই টাকার অপচয় বা তসরুফ হলে তাদেরই ক্ষতি হবে।

উপসংহার:

ধর্মপল্লী ভিত্তিক খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলীর একটি প্রিয় ও অতি প্রয়োজনীয় সংস্থা। এই সমবায় ও ঋণদান সমিতি গড়ে উঠতে ফাদার চার্লস্ ইয়াংসহ বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশপ, ফাদার ও বেশ কিছু খ্রিস্টভক্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বাংলাদেশের ধর্মপল্লীগুলিতে এখন যে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি স্থাপিত হয়েছে, তা কখনোই সম্ভব হত না যদি ফাদারগণ উদ্যোগী হয়ে প্রচেষ্টা না চালাতেন। অনেক ধর্মপল্লীতে ফাদারদের এখনও সেই প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে। অথচ এতে ফাদারদের ব্যক্তিগত কোন লাভ বা স্বার্থ নেই; ধর্মপল্লীরও কোন লাভ নেই। তবে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ দারিদ্র্য জয় করলে বা তাদের উন্নয়ন হলে, ধর্মপল্লীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেরও উন্নয়ন ঘটবে এই প্রত্যাশায় ফাদারগণ এই চেষ্টা চালিয়ে যান। দরিদ্র খ্রিস্টভক্তদের দারিদ্র্য জয় ও ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এই ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতি খ্রিস্টভক্তদের শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই আনবে না বরং এর আসল লক্ষ্য হল ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যদের মধ্যে পাস্পরিক সহযোগিতা, সহভাগিতা ও ভালবাসার আদান-প্রদান। এর মধ্যদিয়ে ধর্মপল্লীতে যেন একটি মিলন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এটাও আশা করা হয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল বর্তমানে ধর্মপল্লীগুলির খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি সেই লক্ষ্য কতটুকু পূরণ করতে পারছে? দিন যতই যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে, খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলি এর মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির টাকা-পয়সা অপচয় ও লোপাট হচ্ছে, সদস্যগণ অর্থনৈতিক উন্নতি না করে বরং অতিমাত্রায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, কিছু সদস্যের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে, ধর্মপল্লীতে প্রায়ই দলাদলি, কোন্দল, বিবাদ, ইত্যাদি বাড়ছে। এতে খ্রিস্টান সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ছে আর এই সুযোগে বাইরের লোকজন খ্রিস্টান সমাজে হস্তক্ষেপ করছে প্রভাব খাটাচ্ছে। তাই খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন বা ঋণদান সমিতিগুলির সদস্যদের এখনই সজাগ হতে হবে আর নতুন করে ভাবতে হবে তারা কিভাবে তাদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি সুন্দর ও টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করবেন। খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের মত একটি ভাল ও কার্যকর পদ্ধতিটিকে কিভাবে তারা এর আদিরূপে ফিরিয়ে আনবেন ও পরিচালনা করবেন তা এখন তাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। পরিচালনা তথা সেবার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের কাজ হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকগুলি গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সেই জন্যে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক গঠন-প্রশিক্ষণ, নিয়মিত ধ্যান-প্রার্থনা, নির্জন ধ্যান-সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা। এই ক্ষেত্রে সদস্যগণ চাইলে কাথলিক মণ্ডলী বা ফাদারগণ তাদের সহযোগিতা করতে সর্বদাই প্রস্তুত॥ ❑

মৃত্যু : খ্রিস্টের পুনরুত্থানে নবজীবন

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

কেউ চিরস্থায়ী নই। এখানে আমরা প্রবাসীর মত জীবন-যাপন করছি। এ পৃথিবীতে আমার বলে যা কিছু আছে, সব কিছুই ফেলে রেখে একদিন আমাদের প্রত্যেককে পাড়ি দিতে হবে পরজগতে। আমাদের জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য ও অবধারিত। যে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ পেতেই হবে। কিন্তু মৃত্যুই শেষ নয়, আছে অনন্ত জীবন। মৃত্যু হল মানুষের ইহজীবনের সমাপ্তি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত জীবনের সূচনা। জীবন মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে অনন্য দান তা শেষ হবার নয়। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ জীবন মৃত্যুর মধ্যদিয়ে এক নতুন রূপ লাভ করে। পৃথিবীতে থাকালীন সময়ে মানুষ তার পার্থিব জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে তার চরম লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সে লক্ষ্য হল ঐশ সান্নিধ্যে চিরকাল ধরে বসবাস করা। এ জন্যে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল 'মৃত্যুর পর কোনো পুনর্জন্ম নেই, আছে পুনরুত্থান। কারণ খ্রিস্ট নিজেই পুনরুত্থান ও জীবন। তাই প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর দৃঢ়বিশ্বাস ও আশা যে, খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর যেমন পুনরুত্থান ও নবজীবন আনয়ন করেছেন। তেমনি আমরাও মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হবো। তাই মৃতলোকের পর্ব দিনে আমরা মৃত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি, যাতে তারা অনন্তধামে সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। একইভাবে মাতা মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা আমাদের নিজেদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে চিন্তা ধ্যান করে আমাদের জীবন অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হই এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে পারি॥ ❑

তিল থেকে তাল
পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাধি

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

(এই প্রবন্ধটির মূল অংশ ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু বিষয় সংযোজন করে পুনরায় তা প্রকাশ করা হলো।)

গুজব ছড়ানো এবং অপ-প্রচার করা একাট বিবেকহীন-বিকৃত মানসিকতাপূর্ণ কাজ যা আবার বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তা করে থাকে। পৃথিবীতে সব সমাজেই মানুষের মধ্যে এই হীন হিংসাত্মক মানসিকতাটি রয়েছে। তবে আমাদের দেশে গুজব ছড়ানো এবং অপপ্রচারে পরচর্চার একটা আজব নেশা মানুষের মধ্যে খুবই প্রকট। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি"। এর মূলে প্রধান প্রবৃত্তিটি হলো 'পরশ্রীকাতরতা'। পৃথিবীর কোন ভাষাতে এমনতর শব্দ নেই যা বাংলা ভাষাতে রয়েছে। এর মধ্যদিয়ে বোঝা যায় আমাদের মানুষের স্বকীয় সতন্ত্র পরিচয়ে যে আমরা পরশ্রীকাতর মানুষ। আর এর জন্য গুজব ছড়ানো এবং অপপ্রচার করার পরচর্চা মানসিকতার 'কাতরতা' খুব প্রবল। আবার এর মধ্যে আমাদের খ্রিস্টান সমাজগুলোতে এই গুজব ছড়ানো এবং অপ-প্রচার এবং পরচর্চার বাড়াবাড়ি আরো একটু বেশি।

গুজব ঘটনার বিকৃতি। গুজব একটা রটনা, চোখে দেখা ঘটনার বর্ণনা নয়, মুখে-মুখে তৈরী রচনা। গুজব একটা জারজ, যার পিতৃ পরিচয় নেই, যার কোন ভিত্তি নেই। গুজব বাস্তবতার বাইরে মানুষের মুখে মুখে ছড়ানো গল্প (Bad rumor is evasion of reality)। গুজব বানিয়ে বানিয়ে বাড়াবাড়ি বক্তব্য। গুজব ছোট্ট ঘটনাকে টেনে টেনে সম্পূর্ণ উল্টো অর্থে পরিবেশন। প্রবাদে আছে- 'Rumor is a great traveller'। রাজা থেকে রাণী, কালো থেকে কাক, তিল থেকে তাল, রাম থেকে রহিম, নয় থেকে নব্বই হলো গুজবের প্রকৃতি। গুজব হলো 'যা না তা', পথে তার চেহারা পাল্টায়, ধরন বদলায়, খোলস পাল্টায় বার-বার। যা খাটো হতে-হতে মূল বিষয় মিলিয়ে যায় অর্থাৎ গুজব প্রসবকালেই অক্কা পায়। গুজবের কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণের আগ্রহ জন্মায় না। এর মূল ভিত্তি হলো 'ওমুকে বললো'। মানুষ ছাড়া অন্য জীবে মিথ্যাচার নেই। মিথ্যার চর্চা মানুষের মধ্যেই রয়েছে। গুজব তারই একটা দিক। গুজব একটা অপপ্রচার। আর অপপ্রচার হলো মিথ্যাচার-মিথ্যার চর্চা। এর বহিপ্রকাশ হলো পরচর্চা, পরনিন্দা ক্ষতিকর সমালোচনা। সামগ্রিকভাবে এ সবই সাংঘাতিক অসামাজিক কাজ। এইগুলো অন্যায়, অপরাধমূলক, অনৈতিক কাজ।

এইগুলো হিংসাত্মক ও ক্ষতিকর কাজ। গুজব ছড়ানো এবং কারো সম্বন্ধে অপপ্রচার করা পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ। যারা হীনমন্য, যারা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত, যারা পরশ্রীকতর ও ঈর্ষাপরায়ণ, যারা সমালোচনা প্রিয় ও অশান্তি প্রিয়, যারা অলস-আড্ডাবাজ কর্মবিমুখ, ও উচ্চাভিলাষী, যারা অন্তর্মুখী ও ব্যক্তিতে দুর্বল, যারা তোষামোদ প্রিয় ও নীতিভ্রষ্ট, যারা সংকীর্ণ ও কুসংস্কার বা প্রাচীনবাদী, যারা অহংকারী ও পক্ষপাতগ্রস্ত তারাই গুজব নিয়ে বাজার করে, অপপ্রচারে পায়তারা করে এবং পরচর্চা ও মিথ্যাচারে মাতামাতি করে। গুজব ছড়ানো, অপপ্রচার চালানো শত্রুর কাজ, মূর্খের কাজ, অশিক্ষিতের কাজ, হুজুগের কাজ, কথায় বলে হুজুগে বাঙালি। গুজব ছড়ানো এবং অপপ্রচার করা এবং পরচর্চা করা ছিদ্রান্বেষীদের কাজ। এরা উন্মুক্ত অবস্থায়ও ছিদ্র দিয়ে দেখে অভ্যস্ত। এটা স্বভাবের দোষ, কারণ তারা মানুষের ভালো কিছু দেখতে পায় না, গঠনমূলক কিছু তাদের চোখে পড়ে না। তাদের কাছে গুণের সমাদর নেই। এরা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

গুজবে অপপ্রচারে ব্যক্তির মান-সম্মান নষ্ট করে, চরিত্রের হানি করে, ব্যক্তির সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়, ব্যক্তিত্বের ক্ষতি করে। গুজব এবং অপপ্রচারে মানুষের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করে ঝগড়াঝাটি বাধায়, সম্পর্ক নষ্ট করে। গুজবে, অপপ্রচারে পারিবারিক, সামাজিক দাঙ্গা বাধায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সন্দেহ সৃষ্টি করে। গুজব এবং অপপ্রচারে ভক্তিতে ভাঙ্গন, প্রেমে ঘৃণা, স্নেহে বৈরীতা সৃষ্টি করে। গুজব এবং অপ-প্রচারে সম্পর্কের আস্থা ও বিশ্বাসের মধ্যে ফাটল ধরায়। গুজব ও অপ-প্রচারে সুখের সংসারে আগুন লাগায়, মানুষের সুনাম নষ্ট করে, বদনাম ছড়ায়। গুজবে কান দিয়ে মানুষ প্রতারিত হয়। অপপ্রচার করে মানুষকে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয়। এরা হত্যাকারী। কারণ এটা মানুষের চরিত্র হনন ও হত্যার চেয়েও নির্মম।

প্রথম দিকে যেমন বলেছি আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যে গুজব ছড়ানো, অপপ্রচার ও পরচর্চার প্রবণতা অনেক বেশি যা অন্য সমাজে ততটা দেখা যায় না। আমাদের দেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা খুব কম। বৃহত্তম সমাজে গন্ডিবদ্ধ এদের সমাজ ব্যবস্থা। এদের দুর্বলতা হলো বৃহত্তম সমাজের সাথে মিশতে না পারা এবং নিজেদের মধ্যেই গুটিয়ে থাকার ঐতিহ্য। এভাবে এই রকম ছোট সংকীর্ণ সামাজিকতায় নিজেদের মধ্যেই স্বগোত্রের লোকদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, সফলতা-ব্যর্থতা, গুণ-গৌরব, হাল-চাল, চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা এবং জাত-পাত নিজ থেকে অন্যের মধ্যে একটু ভালো এবং চোখে পড়ার মত কিছু থাকলেই তা নিয়ে আড্ডা-আলোচনায় বিরূপ মন্তব্য ছেড়ে দেওয়া হয়। উপরন্তু খ্রিস্টানগণ অন্যদের চেয়ে একটু বেশি আয়েশী বিলাসী। তাদের দৃষ্টি নিজেদের থেকে অতিক্রম করে বাইরে বেশি মেলতে পারে না। আর তা থেকেই (সংকীর্ণ দৃষ্টি) নিজের চেয়ে অন্য কেউ ভালো কিছু করে ফেললেই তার মনের মধ্যে অন্যের ব্যাপারে কাতুকুতুপনা এবং কাতরতাপনা জেগে ওঠে।

গুজব ছড়ানো এবং অপপ্রচার ও পরচর্চার প্রবণতা মহিলাদের মধ্যেই বেশি। বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে এই ব্যাপারে কম-বেশি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন সবচেয়ে বেশি প্রবণতা যাদের মধ্যে তারা হলো বিবাহিত মহিলাদের (যারা পৌঢ়ে পড়েনি)। কারণ তাদের মধ্যে বয়স এবং পাওয়া/না পাওয়ার একটা চাহিদা এবং হওয়া না হওয়ার ব্যর্থতার কারণে পরশ্রীকাতরতা প্রকট হয়ে ওঠে। তারপর যাদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায়, তারা হলেন বয়স্কা মহিলারা। কারণ তাদের প্রচুর সময় এবং সেকেলে বা প্রাচীনবাদী চিন্তা ও মানসিকতার জন্য এবং যুগের সাথে খাপ না খাওয়ানোর অপারগতার কারণে। তারপর যারা এই দোষে দুষ্ট তারা হলো পুরুষেরা। কারণ তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানসিকতা। তারা দল করতে জানে না দলাদলি করতে জানে। তারপর যাদের মধ্যে এই প্রবণতা তারা হলো অবিবাহিতা মেয়েরা। তাদের মধ্যে

পরাজয়ের ভয় ও হীনমন্যতাবোধ থেকে ঈর্ষা কাজ করে। তাছাড়া এলাকা ভেদেও গুজব ছড়ানো, অপপ্রচার ও পরচর্চা করার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন-কোন এলাকায় স্বাভাবিক পর্যায়ে যা ঘটে আবার কোন কোন এলাকায় এই প্রবণতা মানুষের মধ্যে এত প্রকট যে, তা সামাজিক ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এর কারণ হলো ঐ স্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি যেখানে পরস্পর বিরোধ, শত্রুতা, ক্ষমতার লোভ, হিংসা পরম্পরাগত ধারায় ঢুকে গেছে।

এছাড়াও কিছু মানসিকতা বিকারগ্রস্ত মানুষ সে শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক যারা স্বভাবগতভাবে নিন্দুক ও কুটনি। একাজ যাদের চরিত্রের সাথে মিশে গেছে তারা মানুষের ভালো কোন কিছুই দেখতে পারে না, সহ্য করতে পারে না।

আমাদের সমাজে গুজব ছড়িয়ে এবং অপপ্রচার-পরচর্চা করে মহিলারাই মহিলাদের বেশি ক্ষতি করে। তারা পাশের বাড়ির পাড়া-পড়শীর মেয়েদের/বৌদিদেরই সম্বন্ধে অপ-প্রচার করে, গুজব ছড়ায়। তাদের দুর্নাম ছড়ায়, বদনাম ছড়ায়, কুৎসা রটায়, মিথ্যাচার চালায়। আমাদের সমাজে এইরূপ গুজব ছড়িয়ে অপপ্রচার চালিয়ে মেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। যেন বিয়ে না হতে পারে তার জন্য মিথ্যা কালিমা লেপে দেওয়া হয়। কোন বৌ বা মেয়েদের চলাচলে একটু বেশি আধুনিকতার ভাব দেখালে তার গোষ্ঠী উদ্ধার করা, একটু বেশি মেলামেশা করতে দেখলে যেন কুটনিদের গা জ্বলে। আর তার মনের জ্বালা নেভানো হয়, টিপ্পুনি কাটা হয়। এইগুলো নিছক হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা ও পরশ্রীকাতরতা।

আমাদের সমাজে, গ্রামে/গঞ্জে মহিলারা, কোন-কোন ক্ষেত্রে পুরুষেরা পথে-ঘাটে, রাস্তায় চলতে চলতে বা দোকানে চা-এর আড্ডায় বসে 'ওই শুনছস' 'ওমুকে বললো' 'কাউকে বলিছ না' বলে বিভিন্ন জনের সামনে কথা বলে নিজের মনের নোংরামিই প্রকাশ করে বেড়ায়। তাছাড়া গির্জার (মীসা) আগে-পরে, বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষার সময়টা একসাথে জড়ো হয়ে অধিকাংশ সময়ই গুজব, অপপ্রচার ও পরচর্চা নিয়ে সময় ব্যয় করা হয়। তারা কখনো ভেবেও দেখে না এগুলো করে তারা কত যে ক্ষতি করছে, অন্যায় করছে। তারা একটুও ভেবে দেখে না এই কান কথার, এই উড়ো কথার কতটুকু সত্য বা আদৌ সত্য কি না। আসলে অপপ্রচারের রসটা সেখানেই যা যাচাই করতে নেই।

এইরূপে গুজব যারা ছড়ায়, অপপ্রচার যারা করে তারা ভুলেই যায় তাদের জীবনেও কত অঘটন ঘটেছে। তারা ভুলেই যায় তাদের পরিবারেও কতজন হয়তো বা নানা অপকর্মের নায়ক/নায়িকা। তারা ভুলেই যায় যে, তাদের ঘরেও মেয়ে রয়েছে, নাতীন-পুতিন রয়েছে। এদের নিজের বেলায় চোখ বন্ধ করে রাখা এবং অন্যের বেলায় চোখ বড়-বড় করে দেখার কুঅভ্যাস কাজ করে। আমার সামনেই এক মহিলাকে অন্য এক পড়শী মেয়ের সম্বন্ধে যা-তা মিথ্যা বলে যাচ্ছিল ... পরে জানতে পারলাম তার নাতীন বিবাহের পূর্বেই নাকি গর্ভবতী হয়েছিলেন। এই যদি হয় অবস্থা। এরা অন্ধ ও ভণ্ড।

আজকাল শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক গুজব এবং অপপ্রচার হয় না - গুজব ও অপপ্রচারের রূপ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল মোবাইল এসএমএস, ইন্টারনেট, ফেসবুক- এর মাধ্যমেও একজন অন্যজনের, একদল অন্যদলের, এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের, এক সোসাইটি অন্য সোসাইটির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালানো হয়। পরস্পরের মান ক্ষুণ্ন করা হয়, সুনাম নষ্ট করা হয়, হিংসাত্মক কাদা ছোড়াছুড়ি হয়। আর অনেকেই না বুঝে বা ভুল বুঝে বা খেয়ালি বশে আবার তা মজা করে খায়। ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ও কিছু-কিছু এই রূপ মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়। আমি ছোট বেলায় দেখেছি এবং কাউকে-কাউকে বলতে শুনেছি- যারা ডায়োসিসিয়ান ফাদারদের বেতনভোগী বলে বলে অপপ্রচার চালাত। এতে পিতা-মাতারা, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত হতো। আজকাল অপপ্রচারে পুরোহিতগণ বেশি করে আক্রান্ত হচ্ছে। অনেকে (যদি কোন ফাদার তার কাছে চক্ষুশূল হন তা হলে) আবার ফাদারকে ঘায়েল করার জন্য মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে গুজব এবং অপপ্রচার করার সুযোগও গ্রহণ করে থাকে।

বয়স্করা অপপ্রচার করে, পরচর্চা করে। কিন্তু তারা এত নির্বোধের মত কাজ করে যে অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনে অবলীলায় অন্যের সম্বন্ধে অপপ্রচার চালায়, পরচর্চার, অপপ্রচারের কুপ্রবণতার ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়। এটা ভয়ানক অন্যায় কাজ।

গুজব ছড়ানো এবং এত কান দিয়ে মূর্খের মত অপপ্রচার করা এবং পরচর্চা করা অনিষ্টের কাজ, দাম্ভিকের কাজ, নিন্দুকের কাজ, হীনমন্যের কাজ। তাই বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষ হিসেবে সুষ্ঠু সমাজ জীবন এবং ব্যক্তিক জীবন-যাপনের জন্য গুজব ছড়ানো অপপ্রচার চালানো, মিথ্যাচার করা অন্যায়-অনুচিত। উদার লোক গুজবে কান দেয় না, পরচর্চা করে না। ধর্মবিশ্বাসী খাঁটি মানুষ অপপ্রচার করে অন্যের ক্ষতি করে না, বিদ্বেষী হয় না, পরশ্রীকাতর হয় না। কাজে ব্যস্ত মানুষ অপপ্রচারে অনর্থক সময় ব্যয় করে না, মিথ্যাচারে কান দেয় না। স্বচ্ছ সুশিক্ষিত মানুষ গুজবে গৌরব বোধ করে না, তারা গুজব ও অপপ্রচার এড়িয়ে যায়, মিথ্যাচার ও পরচর্চা ঘৃণা করে। তারা খেয়ালি হয় না, যুক্তিবাদী হয়।

ব্যক্তিক জীবনে এই প্রবণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, সামাজিক জীবনে এই সংক্রমিত ব্যাধি থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য, নিজের এবং পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার জন্য, অন্যের জীবনের ক্ষতির পিছনে নিজেকে দায়ী/দাগী/অপরাধী পরিচিত না করার জন্য যে নিরাময়ের পথ রয়েছে তা হলো- প্রথমে নিজেকে চিনো, নিজের দিকে তাকাও, নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের দিকেও তাকাও। বাইবেলের বাণীগুলো মনে রাখি যেন সর্বদা "পরের বিচার করতে যেয়ো না যাতে তোমাদের নিজেদেরই বিচারে দাঁড়াতে না হয়" *(মথি ৭:১)*। "অন্যের কাছ থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার আশা কর, তার প্রতিও তোমরা সব কিছুতেই তেমনি ব্যবহার করো" *(মথি ৭:১২)*। "তোমরা যেন অপরের নামে কুৎসা না রটাও, তোমরা যেন মিতাচারী হও এবং সমস্ত ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হও *(১ তিমথি ৩:১১)*"। "তুমি কখনো নিতান্ত লৌকিক যত উপকথা, আষাঢ়, যত গল্পের ধারে কাছেও যেয়ো না, ধর্মশীল মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা কর *(১ তিমথি ৪:৭)*।

পাড়া বেড়ানোর অভ্যাস হয়ে যাওয়ার ফলে কাজ না করার একটা প্রবণতাও জন্মে যায়। শুধু কাজ না করা কেন? গল্প গুজবে সময় কাটানো, পরের ব্যাপারে নাক গলানো, যা বলা উচিত নয় তাই বলে বেড়ানো এসব প্রবণতাও জন্মে যায়- এগুলো পরিত্যাজ্য *(১ তিমথি ৫:১৩)*। যারা দাম্ভিক, অহংকারী, পরনিন্দুক, হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ তারা তখন কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়, উচ্ছৃঙ্খল হিংসা আচারণ করে, হয়ে উঠে এমন মানুষ কারো ভালো কোন কিছুই যে সইতে পারে না *(২ তিমথি ৩:২-৩)*।

আসুন আমরা গুজব রটানো, অপপ্রচার এবং পরচর্চা, পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। আমরা গুজব ছড়াবো না, গুজবে কান দিব না। অন্যকেও গুজব ছড়াতে, অপপ্রচার চালাতে বাঁধা দিব, এর কুফল বুঝিয়ে দিয়ে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখবো।

শেষে আমার প্রবচনটা স্মরণ কারিয়ে দিচ্ছি

'গুজবে গজব দিয়ো না এতে কান
নইলে সংসার করে দিবে খান-খান' ॥ ❑

জীবিতদের জন্য মৃতদের শিক্ষা

ফাদার শিশির কোড়াইয়া

মাথা পেতে নিতে হবে
বিধির বিধান
পর তরে খালি করে দিতে হবে স্থান।

নদীর স্রোতের সাথে-সাথে আমাদের জীবন-নদীতে জীবনাবসানের স্রোতও এসে পড়ে। সে স্রোতের গতিময় পথ থেকে আমরা কেউ বাদ পড়ি না বা পড়তে পারি না। কারণ তা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়ম। যেদিন আমাদের জীবন-নদীতে মৃত্যু নামক স্রোতটি আসবে সেদিন এই সুন্দর, অপরূপ ধরণী, মায়া-বন্ধন, ভোগ-বিলাসিতা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে সেই পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে পরম পিতার রাজ্যে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মানবজাতিকে তাঁর সাথে পুনর্মিলিত এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম-হবার পাপের মধ্যদিয়ে আসে পাপময়তা। যা ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিকল্পনায় ছিল না, তবে বর্তমান বাস্তবতায় এটি আমাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়।

জীবনে শুরু আছে শেষ নেই, দেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা চিরকালীন। খ্রিস্টধর্মমতে আমাদের দৈহিক মৃত্যুই শেষ নয়। এরপর রয়েছে আর এক জীবন। আমাদের দৈহিক মৃত্যুর পর শুরু হয় নতুন এক জীবন স্বর্গীয় অথবা নরকের জীবন। এই পৃথিবীর কর্মের ওপর ভিত্তি করেই আমরা লাভ করি স্বর্গীয় অথবা নারকীয় জীবন।

মৃত্যু শব্দটি একটি দীর্ঘশ্বাস, একটি চাপা কষ্ট, একটি অপ্রিয় সত্য কথা হলেও মানুষের জীবনে মৃত্যু অবধারিত। কবির ভাষায় "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কেবা কোথা রবে"। মৃত্যুর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও চরম পরিণতি সম্পর্কে আমরা যখন সচেতন হই, মৃত্যু তখন প্রতিটি মানুষের কাছে একটা বিভীষিকা, নৈরাশ্য ও চরম বিনাশের প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধু পলের বিশ্বাস আমাদের হৃদরে আশার বাণী সঞ্চার করে "আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচেও থাকি না, আর কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি বাঁচি প্রভুর জন্যই বাঁচি, আর যদি মরি তবে প্রভুর জন্যই মরি"। মৃত্যু শুধুমাত্র ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সেতু রচনা করে। মৃত্যুর এই সেতু পার হওয়া যায় কিন্তু ফিরে আসা যায় না। মৃত্যু মানুষের দৈহিক জীবনের জন্য প্রযোজ্য হলেও আত্মার জন্য স্থান পরিবর্তনের একটি উপায় মাত্র। কেননা আত্মার কোন মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে থেকে যায় কিন্তু আত্মা থাকে অমৃতলোকে, অনন্তকাল বিরাজ করে। খ্রিস্টীয় জীবনের বিশ্বাসের ভিত্তি হলো, মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর পুনরায় ঈশ্বরের সাথে তার মিলন হবে স্বর্গরাজ্যে। আর যদি তাই হয় তবে মৃত্যু হচ্ছে আনন্দের ও নতুন জীবনের প্রবেশ পথ। তবে আমাদের পার্থিব জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদই আমাদেরকে অনন্ত জীবনের পথ দেখায়। আর সেই ধনসম্পদ অর্জন করার অবলম্বন হচ্ছে সততা, ন্যায্যতা ও ভালবাসা। যিশু নিজেই বলেন, "তোমরা বরং স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় কর, কেননা সেখানে মরচে ধরে না; পোকায় নষ্ট করে না, সিঁদ কেটে চোরে চুরিও করে না" *(মথি ৬:২১)*।

মৃতেরা আমাদের সামনে যে শিক্ষা রাখছেন তা হল- এ পৃথিবী, এই চাকচিক্যময় পৃথিবী আমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়, রবং ক্ষণস্থায়ী আবাসভূমি এই পৃথিবী। এখানে আমরা প্রবাসীর মত জীবন-যাপন করছি। এই পৃথিবীতে আমাদের দেহ হল তাবুর মত। তাবু যেমন ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িকভাবেই ব্যবহার করা হয়। তেমনি এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনটা ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িকভাবেই এই পৃথিবীতে আমার-আপনার অবস্থান বা বেঁচে থাকা। তাই এই অস্থায়ী আবাসের দিকে বা অস্থায়ী ঠিকানার দিকে বেশি নজর বা গুরুত্ব দিলে লাভ হবে না। আমরা সবাই যেমন চাই একটি স্থায়ী ঠিকানা, একটি স্থায়ী আবাসভূমি। তেমনি আমাদেরও নজর দিতে হয় স্থায়ী আবাসের দিকে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যারা মারা গেছেন আজ আমাদেরকে বলছেন- টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, সৌন্দর্য, পদ-পদবী তাদের জন্য এখন আর কোন কাজের নয়। তারা এ সবই ছেড়ে গেছেন; সঙ্গে শুধু নিয়েছেন তাদের কাজের ফল। মৃতেরা আজ বলতে চাচ্ছেন- টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, সৌন্দর্য, পদ-পদবী ঈশ্বরের গৃহে স্থান নেবার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে না বরং আমাদের কর্মফল, আমাদের সুন্দর জীবন-যাপন, সাহায্য করার মানসিকতা, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন ঈশ্বরের গৃহে স্থান নেবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আমাদের পূর্বসূরিরা যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা আমাদের বলছেন যে, মাত্র প্রভু যিশুই আমাদের পথ দেখাতে পারেন। তাঁরই শিক্ষা-নির্দেশনা পালন করার মধ্যদিয়ে আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব।

প্রতি বছর ২ নভেম্বর খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'হে মানব তুমি রেখগো স্মরণ যাবে ধূলিতে মিশে'। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের ধূলি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের শরীর আবার সেই ধূলিতে মিশে যাবে। এই দেহের বশে, জাগতিকতার মোহে জীবন পার করে লাভ নেই। বরং আত্মার পরিত্রাণের জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন, কাজ করা প্রয়োজন, সঞ্চয় করা প্রয়োজন। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশায় প্রতিদিনের জীবন আচারণের মধ্যদিয়ে স্বর্গের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করি॥ ❑

পূবাইল জমি বিক্রয়

গাজীপুর জেলায় পূবাইলে ৫.৭৫ কাঠা জায়গা অতিসত্ত্বর বিক্রয় করা হবে।

ঠিকানা : পূবাইল, গাজীপুর

যোগাযোগের ঠিকানা

01718771874

বিপ/২২/২০

মৃত্যু : খ্রিস্টের পুনরুত্থানে নবজীবন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

জন্মের সময় আমরা কান্না করি আর মৃত্যু আসে নিশব্দে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর বা প্রাণীর ধ্বংস বা মৃত্যু আছে। জীবনের মাঝে রয়েছে মৃত্যু সংকেত আবার মৃত্যুও জীবনের নির্দেশক। তাই জন্ম আর মৃত্যু একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে। জন্মালে মৃত্যুও ঘটবে। এ এক কঠিন বাস্তব। কঠিন বাস্তবটা জানলেও প্রিয়জনের মৃত্যু আমাদের মনকে ভেঙে দেয়। তবুও মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক। শুধু যদি জন্ম হতো কিন্তু মৃত্যু না থাকত, তাহলে জগতের গতিও থেমে যেত। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জন্মের পরিপূর্ণতা আসে। যেদিন জন্ম হয় সেদিনই মৃত্যু নিশ্চিত হবে জানা যায়। মানব জীবনে মৃত্যু অনিবার্য। তাই মৃত্যু হলো প্রস্থান, সমাপ্তি, নিশেষ, স্থবির, বিনাশ, বিচ্ছিন্নতা, নিস্প্রাণ। পৃথিবীতে জন্ম নিলে মরতে হবে মানুষের জীবনে এই একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম, একটি অভিজ্ঞতা। যা মানুষ জীবনকালে একবারই অভিজ্ঞতা করতে পারে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা রাখে না। তাই বলা হয়েছে, আমাদের জন্ম নিশ্চিত ছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু জন্ম নেওয়ার পরে মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যু পৃথিবীর কোন নিয়ম মানে না, কোন শৃঙ্খলাকে তোয়াক্কা করে না। কারো মতামত নিয়ে চলে না। এই জগতে কার কতদিন হল, কে কতদিন থাকবে, কে আগে বা পরে যাবে, সে হিসাব মৃত্যু করে না। সাধু-পাপী, ধনী-গরীবের বাছ-বিচার করে না। কে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কে যুবক-যুবতী, কে শিশু-কিশোর পৃথিবীর সেই নিয়ম মৃত্যু বিচার করে না। সে সবার কাছেই নিষ্ঠুর। সবাইকে সে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করে। মৃত্যু কখনও ভাবে না যে, কে না থাকলে কার কি হবে, কে কার একমাত্র ভরসা, কে বংশের একমাত্র প্রদীপ। তাই মৃত্যু খুব ছোট একটা শব্দ হতে পারে কিন্তু এর গভীরতা বিশাল। মৃত্যু হলো জীবনের সমাপ্তি।

মৃত্যু শব্দটি একটি দীর্ঘশ্বাস, একটি চাপা কষ্ট, একটি অপ্রিয় সত্য কথা হলেও মানুষের জীবনে মৃত্যু অবধারিত। কবির ভাষায় "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কেবা কোথা রবে।" মৃত্যুর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও চরম পরিণতি সম্পর্কে আমরা যখন সচেতন হই তখন প্রতিটি মানুষের কাছে মৃত্যু একটা বিভীষিকা, নৈরাশ্য ও চরম বিনাশের প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধু পলের বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে আশার বাণী সঞ্চার করে "আসলে আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচেও থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যেই বাঁচি; আর যদি মরি তাহলে প্রভূর জন্যেই মরি" *(রোমীয় ১৪:৭-৮)*। মৃত্যু শুধুমাত্র ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সেতু রচনা করে। মৃত্যুর এই সেতু পার হওয়া যায় কিন্তু ফিরে আসা যায় না। মৃত্যু মানুষের দৈহিক জীবনের জন্য প্রযোজ্য হলেও আত্মার জন্য স্থান পরিবর্তনের একটি উপায় মাত্র। কেননা আত্মার কোন মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে থেকে যায় কিন্তু আত্মা থাকে অমর্তলোকে, অনন্তকাল বিরাজ করে। খ্রিস্টীয় জীবনের বিশ্বাস হল খ্রিস্টের পুনরুত্থানে নবজীবন। তাই মৃত্যু হচ্ছে আনন্দের ও নতুন জীবনের প্রবেশ পথ। সুতরাং মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশায় প্রতিদিনের জীবন আচরণের মধ্যদিয়ে স্বর্গের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করি। খ্রিস্টবিশ্বাস অনুসারে মৃত্যু মানে, 'অনন্ত জীবন'। সাধু পল বলেছেন, "আসলে আমার কাছে বেঁচে থাকা মানেই খ্রিস্ট; আর মরে যাওয়া, সে তো একটা লাভ!" *(ফিলিপ্পীয় ১:২১)*। আমাদের বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে লাভ করি। মৃত্যু হলো খ্রিস্টের সাথে মিলন। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ যিশু বলেছেন, "তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর" *(মার্ক ১২:২৭)*।

মৃত্যু সম্পর্কে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুত্রবধূকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখলে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করি না বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁকড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনা বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহে-ই এগিয়ে চলছে এই কথাটিকে ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে ভাবলেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে, সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। তাই যত পাপ যত ভয়; যত শোক ঐখানে।" আসলে আমরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। তাই মৃত্যু হল প্রবাস যাত্রা। যার মধ্যদিয়ে আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মৃত্যুর দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি আবার তাঁরই সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি। আভিলার সাধ্বী তেরেজা মৃত্যুর বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে।" মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকজনকে পিতার রাজ্যে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলছে। মৃত্যু ছাড়া আমরা কেউ পিতার রাজ্যে যেতে পারি না। ইহজীবন থেকে পরলোকে যাবার জন্য মৃত্যু আমাদের একমাত্র দূত, একমাত্র সেতু, একমাত্র দরজা, আমাদের তরী, আমাদের মধ্যস্থতাকারী। হ্যাঁ, মৃত্যু একটা গৌরবের বিষয়। আসলে মৃত্যু আমাদের ধ্বংস করে না, বরং আমাদের জীবনকে একধাপ এগিয়ে দেয়, আমাদের সহায়তা করে পিতার কাছে, পিতার রাজ্যে যাবার জন্য।

মৃত্যু আছে বলে মানুষের পরিবর্তন হয়। একদিন মৃত্যুবরণ করবে সে কথা চিন্তা করে মানুষ ভাল কাজ করে, অন্যকে ভালোবেসে দয়া করে। মৃত্যু আছে বলে আমরা এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যেতে পারি, নতুন আরেক জীবন লাভ করতে পারি, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "জীবনে মৃত্যু যেখানে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।" তিনি আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে থেকে সক্রেটিস ও তাঁর বাণী হারিয়ে যাবে শুধু কবরটাই থাকবে এমন যেন না হয়। কিংবা সক্রেটিসের চেয়ে যেন তাঁর কবর বড় না হয়ে ওঠে।" তাই মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নয়, সেও আরেক জীবন, মৃত্যু নামক এক দূত। কবি গুরু কবিতায় বলেছেন, 'জানি দিন অবসান হবে/ জানি তবু বাকি রবে/ রজনীতে ঘুমহারা পাখি/ এক সুরে গাহিবে একাকী।' পৃথিবীতে আমরা

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

করোনাকাল এখনও কাটেনি

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

মরণঘাতক করোনাভাইরাস আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সুন্দর ও আলোকিত পৃথিবীকে অন্ধকারময় ও মৃত্যুপুরীতে পরিনত করেছে। এখনও বিশ্বে প্রতিদিন করোনার মরণছোবলে মৃত্যুবরণ করছে হাজার-হাজার মানুষ এবং করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ। আমরাও নিষ্ঠুর করোনায় আক্রান্ত। নির্মম করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুভয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। চীনে করোনা শনাক্তের পর আমাদের দেশে প্রথম করোনা রোগি শনাক্ত হয় ৮ মার্চ, ২০২০। আজ দীর্ঘ আট মাস যাবৎ আমরা করোনায় বসবাস করছি। আমাদের করোনা প্রাদুর্ভাব শুরুতে সরকারের দ্রুত নেওয়া পদক্ষেপ যেমন- প্রয়োজন ব্যতিত বাসা হতে বের না হওয়া, সর্বদা মাস্ক পরিধান, সামাজিক দুরত্ব, ঘন-ঘন হাত ধোয়া, হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, গার্মেন্টস, মার্কেট, গণপরিবহণ বন্ধকরণের মাধ্যমে করোনা সংক্রমণরোধ করার সুব্যবস্থা হয়। তখন সকল জনগণ সকল কিছু মেনে চলতে থাকে। অতপর করোনা আক্রান্তের শুরুর দীর্ঘ চারমাস পর সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার শর্তে শুরু মাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতিত সকল কিছু খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এখন দেখা যাচ্ছে, মানুষ মনে করছে ও প্রকাশ্যে বলছে করোনা নেই, করোনা মরে গেছে, করোনা চলে গেছে। আর এর ফলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাকে একদম তোয়াক্কা করছে না। এখন ৭৫% লোক মাস্কবিহীন, সামাজিক দুরত্বের বালাই নেই, গণপরিবহনে গাদাগাদি যাতায়াত, অযথা অনেকের আড্ডা করোনাকালে আমাদের জন্য বড় ভয় ও হুমকিস্বরূপ। করোনা কিন্তু ভুলেও কারো জন্য বিন্দুমাত্র করুণা করছে না, করছে মরণ আঘাত। এখনো করোনার উন্নতি খুবই ধীরলয়ে চলছে।

ইউরোপে পুনরায় করোনার প্রকোপ বাড়ছে শীতের আগমনের সাথে সাথে। করোনা শীতকালে ভয়ংকর আঘাত হানতে পারে বলে হুশিয়ার করছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ। অতএব ইউরোপে করোনায় শীতের দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের জন্য বড় অশনি সংকেত। কারণ শীত আমাদের দেশে আসন্ন। তাই ইউরোপের মতো করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আমাদের মরণ আঘাত করলে কি হবে জানি না। অতএব আমাদের এখনই সাবধান হওয়া জরুরী প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, করোনা কিন্তু চলে যায়নি। করোনা আমাদের চারপাশে ঘুরছে, সুযোগ পেলেই মরণকামড় দিবে। আমরা করোনাকালেই এখন বসবাস করছি। তাই করোনা হতে সুরক্ষার জন্য নিজকে সতর্ক ও সচেতন হয়ে অবশ্যই পূর্বের ন্যায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, অন্যকে উৎসাহিত করতে হবে মেনে চলতে। প্রাত্যহিক মাস্ক পড়া, সামাজিক দূরত্ব, জনসমাগম হতে দূরে থাকা, হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহারের মাধ্যমে করোনার প্রকোপ হতে দূরে থাকা। আমরা যাই বলি না কেন, যতদিন না পর্যন্ত বিশ্বে সাধারণ মানুষের কাছে করোনার টিকা অথবা ভ্যাকসিন না আসবে ততদিন একমাত্র সর্তক সচেতন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেই করোনার ভয়াবহতা হতে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সত্যিকার অর্থে মরণঘাতক করোনাভাইরাস পৃথিবীর বুকে কতদিন, কত মাস, কত বছর বা কত যুগ থাকবে তা কেউ বলতে পারছে না। তাই নিজেদের সুরক্ষা নিজেদেরই নিশ্চিত করে বাঁচতে হবে সুন্দর পৃথিবীতে॥ ❑

১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পুষ্প রানী ক্রুশ

জন্ম : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১৪ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম : দড়িপাড়া ধর্মপল্লী, দড়িপাড়া

কালীগঞ্জ, গাজীপুর

"মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে, চলে গেছ ফিরে চিরশান্তির নীড়ে।
রেখে গেছ সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো যা আজও আমাদের অন্তরে।"

প্রাণপ্রিয় মা,

দেখতে-দেখতে কেটে গেল ১০টি বছর, অথচ মনে হয় সেই দিনের কথা। তুমি আজও বেঁচে আছো আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে। প্রতিক্ষণেই আমরা তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি, তোমার আদর্শ, দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি তোমার যে উদারতা, মমত্ববোধ আজও কেউ ভুলতে পারেনি, কোনদিন ভুলতে পারবোও না।

তোমার শোকার্ত স্বামী এবং স্নেহের সন্তানেরা তোমার শূন্যতা প্রতিনিয়ত অনুভব করে। মৃত্যু তোমাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও কিন্তু সাধ্য কি তার আমাদের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেবার। আমাদের ছেড়ে তুমি যে শান্তির নীড়ে চলে গেছ তার নাম স্বর্গধাম।

সেই স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন পথে চলতে পারি। আজ তোমার ১০ম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই পরিবারবর্গ

স্বামী : ক্লেমেন্ট পিউরীফিকেশন

বড় মেয়ে : সিস্টার সন্ধ্যা হেলেন পিউরীফিকেশন

ছেলে ও বৌমা : শ্যামল ও শিলা, সঞ্জিত ও এডভোকেট চন্দনা, সুবীর ও মুন্নী

মেয়ে ও জামাই : সুষমা ও ষ্টিফেন কোড়াইয়া

নাতি ও নাতনী : শুভ, স্টারলি, রিপন, রাসেল ও ডা: রীমা।

বিজ্ঞা/২১১/২০

এসো পরিবেশকে ভালবাসি

পলাশ প্রদীপ মণ্ডল সিএসসি

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার ও লিখন প্রকাশ করছেন। কিন্তু জলবায়ু তার স্বরূপ থেকে বিরূপে ক্রমিক ধাবমান। যদি ধারাবাহিকভাবে কোন অঞ্চলে বা দেশে বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পেতেই থাকে, তখন আমরা তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলছি। মনে করি, ২০ বছর পূর্বে বাংলাদেশের তাপমাত্রা ৩৪-৩৫ ডিগ্রি হলেই অনেক কষ্ট হয়ে যেত। গত বছরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে উষ্ণতার কোন স্তরে আমরা আছি, আগামী ১০ বছর পরে বাংলাদেশের তাপমাত্রা কিরূপ পরিবর্তন হবে? যদি এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে পৃথিবী গ্রহটি প্রাণীকূলের জন্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে এবং মঙ্গল গ্রহের মতো অবস্থা বিরাজিত হবে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ বরফ আছে তা গলতে শুরু করবে। তরল পানি বায়বীয় আকার ধারণ করবে। তখন বেঁচে থাকার জন্য পানি পাওয়া যাবে না। যদি উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তাহলে ভূমিতে চাষাবাদ হবে না। মানুষের খাবারের ঘাটতি দেখা যাবে। এক সময় নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবো। যদি চিন্তা করি নারায়ণগঞ্জে প্রকৃতির বিপর্যয় হচ্ছে তাতে আমার কি? এতে আমরা সকলেই প্রভাবিত হব। যেমন রূপে করোনাভাইরাসের প্রভাব আজ আমরা সমগ্র বিশ্ব ভোগ করছি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো পরিবেশকে ধ্বংস করার জন্য অনেকাংশে দায়ী কারণ তারা আমাদের দেশের তুলনায় বেশি জ্বালানী ব্যবহার করছে। যা বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করছে। ঘূর্ণিঝড় বার-বার দেখা দিচ্ছে কারণ যখন সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৬-২৭ ডিগ্রি হয় তখন ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপ বৃদ্ধি পেলে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ঘনত্ব কমে যায়। যেহেতু পৃথিবী ঘূর্ণায়মান তাই বাতাস ঘুরে-ঘুরে উপরে উঠতে থাকে। উপরে গিয়ে এক কুণ্ডলী তৈরি করে এবং ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। তাই যখন উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তখন বায়ুমণ্ডলে লঘুচাপ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম একটি কারণ বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি। আমরা অনেকে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করতে বেশি অভ্যস্ত। একটি গাড়ি যখন একজন মানুষকে বহন করে, তখন একজনের জন্য একটি গাড়ি সামগ্রিকভাবে রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করে। অপরদিকে, জ্বালানী তেলের অপচয় বৃদ্ধি পায় এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করে। আমরা যদি গণপরিবহন ব্যবহারে অভ্যস্ত হই তাহলে উল্লিখিত সমস্যাগুলো আমাদের সম্পদে রূপান্তিত হবে। যা পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে। বর্তমানে যা কিছু আছে তাতে আমার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অধিকার নেই, আছে সবারই সমান অধিকার। এই সম্পদের অধিকার নতুন প্রজন্মেরও আছে। শুধু মুখে নয়, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করার দায়িত্ব বর্তমান সমাজের। আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংলাপ, সেমিনার, আলাপ-আলোচনা করতে হবে। এর উৎস খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা করতে হবে।

আজ আমরা কৃত্রিম ঔষধের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পরেছি। ঔষধ আসে বিভিন্ন ঔষধী গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে। কিন্তু আমরা গাছপালা কেটে প্রাকৃতিক পবিবেশকে ধ্বংস করে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করছি। প্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। ফলে ঔষধী গাছ আর পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের উচিত এই বছরে প্রত্যেকটি পরিবারে অনন্ত একটি করে যে কোন উপকারী বৃক্ষ রোপণ করা। আমরা প্রকৃতির ফল খেতে পছন্দ করি। আজকাল শিশুরা প্রাকৃতিক ফল খাওয়া ভুলে গিয়ে খাচ্ছে বাজারে প্রস্তুতকৃত ও বাজারজাতকৃত বিভিন্ন ফলের রস। এটি প্রাকৃতিক নয়। এটি বেশিক্ষণ রেখে দেওয়া যায় না। প্রকৃতির ফলে রয়েছে ফাইবার যা শরীরের জন্য উপকার। কিন্তু প্রস্তুতকৃত ফলের রসে রয়েছে মিষ্টি যা শরীরের জন্য ঝুঁকি হতে পারে। আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। করোনা ভাইরাসে কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার একটু নিচে নেমে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সোলার সিস্টেম ব্যবহারের আইন চালু হয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে ছাদে সোলার থাকলেও তার ৯০% অকার্যকর। এতে দেখা যায় তাপবিদ্যুৎ এর ব্যবহার হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দেশে এর উপযোগিতা অনেক বেশি কারণ বছরের প্রায় সময় সূর্যের আলো পায়। সোলার সিস্টেম এর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের প্রতিটি বাড়ির কক্ষে কমপক্ষে একটি করে ফ্যান, লাইট ও এসি রয়েছে। যখন বিদ্যুৎ থাকে আমরা এগুলো সবই প্রায় ব্যবহার করি। আর যখন বিদ্যুৎ চলে যায় তখন পরিবারের সকলে একটি ফ্যানের নিচে এসে একত্রিত হয়। মনে হয় যেন পরিবারে এক আদিম বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ (IPS) কম থাকে। বিদ্যুৎ থাকতে আমরা এর ব্যবহার বুঝতে পারি না, যখন থাকে না তখন আমরা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ করার দায়িত্ব আমাদের কারণ এগুলো আমাদের পরিবেশেরই অংশ। অপরদিকে শিল্প কারখানাগুলো যেন পরিবেশকে দূষিত করতে না পারে তার জন্য জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ শিল্পকারখানার প্রধান কাচামাল হচ্ছে- অর্থ। ব্যবসার জন্য গ্রিন ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে ঋণ ব্যবস্থা চালু করে। তাহলে শিল্প কারখানাগুলো আরো সচেতন হবে। পরিবেশ দূষণের কারণে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এসিড বৃষ্টি বৈশিক উষ্ণতা, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং গ্রিন ইকোনমি সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা যতই বৃদ্ধি পায়, মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে ততই বসবাস করার আগ্রহ প্রকাশ করে। যখন কোন ব্যক্তি প্রথমে শহরে আসে তখন তিনি শুধুমাত্র মাথা গোজার ঠাইটুকুর সন্ধান করেন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সাথে-সাথে বসবাসের আবাসস্থল পরিবর্তন হয়। তখন সে উন্নত ও আরামদায়ক পরিবেশে বসবাস করার বাসনা পোষণ করে। বিশেষ করে, যেখানে গাছপালা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হাতছানি রয়েছে। তার নিজের ফ্ল্যাট ও বাড়ির ছাদে বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা ও বনসাই দিয়ে সজ্জিত করেন। মানুষের সাথে প্রকৃতির যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে তা উপলব্ধি করা যায়। মা মারীয়া যেমন তার সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিলেন, তেমনি আমাদের উচিত এই পরিবেশকে ভালবেসে বুকে আগলে রাখা। পরিবেশ রক্ষায় ছোট একটি প্রার্থনা-

হে সর্বশক্তিমান, তুমি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু এবং তুমি প্রতি ক্ষুদ্রতম সত্ত্বার মধ্যে উপস্থিত আছো। তোমার এই কোমলতার আলিঙ্গনের উপস্থিতিতে তোমার ভালবাসার শক্তি আমাদের ওপর চালিত কর। যাতে আমরা এই সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে পারি আমাদের আশিসধন্য কর, যাতে এই পৃথিবীতে আমরা সকলে ভাই-বোনের মতো বসবাস করতে পারি॥

আমাদের জীবনে তোমার নিরাময়তার শক্তি বর্ষণ কর যেন বিশ্বকে রক্ষা করতে পারি এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি।"

- আমেন।

প্রকৃত ভালবাসা

এমি ত্রিপুরা

সবুজ শ্যামল সুরভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামটির নাম শান্তিনগর। এই গ্রামে প্রিতম আর জয়া দুজনের জন্ম। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে প্রিতম ৪র্থ। এদিকে জয়াও ছয় ভাই বোনের মধ্যে ৪র্থ সন্তান। প্রিতম ও জয়া দুজনে ছিল খুব সহজ-সরল। নম্র ও ভদ্র। একে অপরের সাথে ছোট থেকে তাদের খুব ভাল সম্পর্ক। তারা দুজনেই লেখাপড়া মোটামুটি ভাল। শুধু লেখা-পড়াই নয়' খেলাধুলা গান- বাজনা, প্রার্থনা ইত্যাদি কাজগুলো এক সাথে করতো। এমনকি স্কুলেও এক সাথে যেত। প্রিতম জয়ার থেকে এক বা দুই বছরে বড়। তাদের দুজনের গুণ ছিল সুন্দর আচার আচরণ, ভাল ব্যবহার অন্যকে সাহায্য করা, অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। প্রিতমের বৈশিষ্ট্য হাসি খুশি চটপটে, উদার এবং গান গাইতে খুব পছন্দ করে। জয়াও খুব শান্তশিষ্ট চুপচাপ, পরিবারের যেমন বাইরেও চুপচাপ। লাজুক স্বভাব। জয়া খুব সুন্দর করে মুচ্‌কি হাসি দেয়। বাড়ির কাজের পাশাপাশি বাবা-মার সাথে কাজ করা ইত্যাদি। জয়া গান শুনতে খুব পছন্দ করে এবং তার প্রিয় গান ছিল : যদি বন্ধু হও, যদি বাড়াও হাত, যেন থামবে ঝড়, মুছে যাবে রাত..। জয়ার ওই সুন্দর মুচ্‌কি হাসি প্রিতম খুব পছন্দ করে। যখন সময় ও সুযোগ হয় জয়াকে অনেক মজা ও আনন্দের গল্প শোনানোর। কিন্তু জয়া মুখ খুলে হাসবে না। সব সময় মুচ্‌কি হাসি দেয়। যা হোক, গ্রামের সকল মানুষ প্রিতম ও জয়াকে অত্যন্ত ভালবাসতো। কারণ তারা দায়িত্বশীল, আদর্শ এবং আন্তরিক। এভাবে তারা আস্তে-আস্তে বড় হল। প্রিতম প্রাইমারি শেষ করে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হল। গ্রাম থেকে শহরে এসে প্রথম দিকে খুব খারাপ লাগতো। তার থেকে বেশি মন খারাপ হত জয়ার জন্য। জয়াকে ছেড়ে এসেছে তাই। তবে সেই পড়াশুনায় মন দিতে শুরু করল, একই সাথে খুব প্রার্থনা করত যাতে জয়াও শহরে (মেয়ের হোস্টেলে) আসতে পারে। এভাবে প্রিতমের দিন গুনতে লাগল। দেখতে-দেখতে বছর শেষ নুতন বছর শুরু। আর এই বছরটি প্রিতমের জন্য বড় আনন্দ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়ার কৃপা। কেননা জয়া মেয়ে হোস্টেলে এসেছে এবং স্কুলে ভর্তি হয়েছে। জয়াকে দেখে প্রিতম খুব খুশী। আজ মনটা প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। আবার তারা দুজনে সুন্দর সর্ম্পক বজায় রেখে দিন চলতে লাগল। দেখতে-দেখতে এইবার প্রিতম ৯ম শ্রেণী আর জয়া ৮ম শ্রেণীতে পড়তে লাগল। জেএসসি পরীক্ষা কাগজ পত্র, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি ঠিক করা, ফটোকপি করার কাজ প্রিতম নিজেই করে দিয়েছে। জয়া এই সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ দেয় প্রিতমকে। এতে প্রিতম অনেক খুশী হয়। এভাবে তারা পড়া-শুনায় মন দিল। বছরে শুরুতে তারা ভালভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা শুরু করল। আর এই সময় থেকে প্রিতম আশ্রয় খুঁজে পায় ভালবাসার বেলাভূমিতে। প্রিতম তার মনের কথা জয়াকে বুঝতে দেয়নি। দিন গড়তে থাকে দুজনে আস্তে-আস্তে খুব কাছাকাছি আসে। কোন কোন সময় ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে একে অন্যকে সময় দেয়। সহভাগিতা করে, কোথাও গেলে অন্যদের সঙ্গে জয়াকেও সাথে করে নিয়ে নেয়। ফল কিনতে, ডাক্তারের কাছে যেতে মাছ ধরতে ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যায় জয়াকে। আর জয়াও প্রিতমের কথা কোন সময় না করে না। এভাবে বছর শেষে তারা পরীক্ষার জন্য একদম প্রস্তুত হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করল। দেখতে-দেখতে ফলাফলের দিনও এসে গেল এবং দুজনে পাস করল। প্রিতম এবং জয়া তাদের এই সুন্দর ফলাফলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রার্থনা করল। সময়ের আবর্তনের তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে ওঠে। জয়াও হয়ে গেল প্রিতমের ধ্যানও, জ্ঞান, স্বপ্ন সাধনা। জয়া গভীর মমতায় ও অকৃত্রিম ভালবাসায় তাকে ভরিয়ে তুলতে লাগলো। প্রিতম বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। জয়া ৮ম শ্রেণী পরীক্ষা পাস করে মানবিক বিভাগে ভর্তি হলো। এবার তাদের ভালবাসা আদান-প্রদান করার দিন এসে গেল। হৃদয় উজার করে স্নেহ মমতা আর প্রেম-প্রীতির টানে আপন ব্যক্তিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রিতম জয়ার জন্য গোলাপ ফুলের ডায়েরী এবং একটি রিসা (ওরনা) কিনে দিল। এদিকে জয়াও তার পছন্দে একটা গেঞ্জি কিনে দিলো। এভাবে তাদের ভালবাসা আদান-প্রদান হলো অথচ কেউ কাউকে বলতে পারেনি– আমি তোমাকে ভালবাসি। তাদের সম্পর্ক গড়ার সেই বছর থেকে তারা এভাবে আদান-প্রদান করছে। সেই দিন রাত্রে প্রিতমের ঘুম হয়নি। সারাক্ষণ জয়াকে নিয়ে ভাবতে লাগলো। কিন্তু কখনও কোন সময় দুজনে কথা হয়নি। কেননা তারা হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করে। হোস্টেলে নিয়ম কানুন ঠিকমতো মেনে চলতে হবে এবং মেনে চলে দুজনেই। জয়া ছিল লাজুক স্বভাবে, কারও সঙ্গে কথা বলার তার সাহস নেই। যদি কোনো জরুরি বা বাধ্য হয়ে বলতে হয় তখন জয়া লজ্জায় লাল হয়ে যেত। তাই প্রিতমও জোর করে না জয়াকে। এভাবে তাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। তাদের কোন কথা নেই, সাক্ষাৎ নেই তবুও তারা দুজন দুজনে খুব ভালবাসে এবং প্রার্থনা করে। যাতে ভাল থাকে সুস্থ থাকে। তাদের অপেক্ষা থাকে কবে ছুটি হবে। ছুটিতে গিয়ে তারা দুজনে সময় দিবে এক সাথে গল্প করবে। তাদের বুকে জমাট বাঁধা কথা পাশাপাশি বসে বলবে ইত্যাদি। তাদের দুজনে এই কল্পনা-ভাবনা সৃষ্টিকর্তাও পূরণ করে দিল। কিন্তু প্রিতমের এসএসসি রেজাল্টের পরে শুরু হয় তাদের নতুন জীবন যুদ্ধ। প্রিতম এসএসসিতে দুটো সাবজেক্ট খারাপ করেছে। সুতরাং তাকে ২য় বার অপেক্ষা করে আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এদিকে জয়া ভাল পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু প্রিতম দুর্ভাগ্যবশত এবারও ফেল করে। জয়ার বাবা মার স্বপ্ন ছিল যে, তাদের মেয়ে একদিন শিক্ষিত মানুষ হবে।

তাদের এ স্বপ্ন পূরণের জন্য তারা জয়াকে পাঠিয়ে দিল ঢাকায়। জয়া যেন শিক্ষিত হয়ে আবার ফিরে আসে। আর অন্যদিকে পড়ে রইল প্রিতম। এত চেষ্টা করেছে তবুও পাস করতে পারল না। তাই সেই ছোট-খাট কাজ নিল নিজের এলাকাতে। প্রিতম ও জয়ার জীবনে একটাই লক্ষ্য ও আশা ছিল তারা দুজনেই একদিন আবার মিলিত হবে। জয়া এসবেই মধ্যে পড়াশুনা একধাপ এগিয়ে গেল। আর প্রিতম ফেল করার কারণে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারল না। তাই প্রিতম এখন ছোট খাট কাজ করে পরিবারে খরচ চালায় এবং নিজের জন্যও। অন্যদিকে, জয়ার কোন খবরই নেই। জয়া ঢাকায় যাবার পর প্রায় দুটি বছর কেটে গেল কোন খোঁজ-খবর নেই। অনেকবার জয়ার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু হয়নি। কেননা জয়ার তার পরিচালিকার মোবাইল দিয়ে বাড়িতে যোগাযোগ করে। জয়া কেমন আছে এটুকু জানতে সুযোগ হয়নি। এই সকল ব্যাথা নিজের বুকে চেপে রেখে নিজের কাজের মন দেয় প্রিতম। প্রিতমের বড় বিশ্বাস ও আশা ছিল জয়া কোনদিন তাকে ভুলে যাবে না এবং ছুটিতে আসলে তাকে আগে খুঁজবে। এই আশা প্রিতম দিন গুনতে লাগলো। দেখতে-দেখতে প্রিতমের সেই আশা পূর্ণ হতে চলল। জানতে পারল জয়া ছুটিতে আসছে। প্রিতম মহানন্দে অপেক্ষা রইল কখন জয়া আসবে। যখন দেখছে জয়া আসছে দৌড়ে গিয়ে হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল কেমন আছ? জয়া– ভাল, তুমি কেমন আছ? প্রিতম আমি এই মুহূর্তে খুব ভাল। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তাদের মাঝে রাগ-অভিমান ঝগড়া বেশিদিন থাকে না। এসবই মধ্যে তাদের সম্পর্ক খুব বড় হতে থাকে। প্রিতম একদিন এসে বলে জয়া এটা তোমার জন্য। নাও তোমাকে খুব মানাবে। জয়া প্রথমে নিতে চাইনি পরে প্রিতমের কথাই গ্রহণ করল এবং কি আছে খুলে দেখলো গোলাপি রঙে একটি ড্রেস। এইসব কেন? প্রিতম: আগে বল তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা? জয়া: তোমার পছন্দ মানে আমার পছন্দ। জয়া আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, আমার এই জীবনে শুধু তোমাকে চাই। এই জীবন ছাড়া তোমাকে বেশি কিছু দিতে পারব না। তোমাকে একটা কথা বলার জন্য আমি অনেক দিন সুযোগ খুঁজছিলাম। আজি তোমাকে জানিয়ে দিলাম আমার ভালবাসার কথা। জানি না আমার কথা শুনে তুমি কি মনে করবে। তারপরেও আবার বলছি, আমার প্রাণের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবেসে যাব এইটা সত্য। তুমি নিশ্চয় না করবে না। জয়া এবার প্রিতমের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল। প্রিতমের মুখ থেকে এ কথা শুনবে তা বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর জয়া তার কথায় মাথা নেরে সম্মতি জানাল। এতে প্রিতম অনেক খুশী। অবশেষে জয়া ঘুমোতে গিয়েও ঘুম আসছে না। সারাক্ষণ প্রিতমের কথাগুলো তার কানে বেজে ওঠেছে। প্রিতম আর জয়া একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না। তারা আবিস্কার করল তাদের মধ্যে ভালবাসা অনেক গভীর হয়ে গেছে। প্রিতম একদিন জয়াকে ডেকে বলল তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমার সাথে সারাজীবন থাকবে। এতে জয়া মুচকি হেসে আশ্বাস দিয়ে বলল যে, সে কখনো তাকে ছেড়ে চলে যাবে না। এইবার জয়া বলল, প্রিতম তুমিও বল তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। কেন জানি মনে হয় এক ঝাপ বৃষ্টি এসে তোমাকে ভিজিয়ে নিয়ে যাবে। তাইতো দিন-রাত বার-বার তোমার শুন্যতা মনে করিয়ে দেয়। আজ এই হাতে হাত রেখে আমাকে আবার বল আজীবন তুমি আমারই থাকবে। আস্তে - আস্তে তারা নিজ-নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হল। হঠাৎ প্রিতমকে চলে যেতে হল তার কর্মস্থলে। বড় প্রোগ্রাম আছে, সেখানে প্রিতমকে পরিচালনা করতে হবে। এদিকে জয়াও সামনে রেজাল্ট ভাল হলে নতুন জায়গায় যাবে গঠন নিতে। অন্যদিকে, প্রোগ্রামে গিয়ে প্রিতম অনেকজনের সাথে হয়ে গেল। এরই মধ্যে একটি মেয়ে প্রিতমকে পছন্দ করে ফেলেছে। মেয়েটিকে প্রিতমের বাবা-মা সবাই জানে চিনে এবং পছন্দও করেছে। প্রিতম প্রোগ্রাম শেষ করে জয়ার কাছে সব খুলে বলল এবং মেয়েটির ছবিও দেখাল। জয়া খুব কষ্ট পেয়েছে কিন্তু সে কষ্ট বুকে চেপে রেখে মুচকি হেসে বললো- মেয়েটি খুব সুন্দর এবং খুব মিষ্টি মেয়ে। প্রিতম : জয়া শোন, তুমি কিছু মনে কর না। আমি তাকে বলেছি তোমার আর আমার সর্ম্পক কথা। জয়া কোন কথা বলল না। বাড়ি এসে জয়া মন বসাতে পারল না কোন কিছুতে। একা বসে-বসে ভাবতে লাগলো–মনে পড়ে কত কথা বড়ই কঠিন একা থাকা হাসি-খুশী, দুষ্টামি, সেসব সুখের স্মৃতি আসে যায় এই মনে আমাকে কাঁদাতে। দুহাত ভরিয়ে দিয়েছিলে এতদিন কত খুশি আমাকে তুমি। সোনাঝরা দিনগুলো আজ কোথায় হারিয়ে গেল সব কিছু শুন্য যে লাগে। এইসব ভাবতে-ভাবতে জয়ার চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো অশ্রু। এমনই সময়ে প্রিতমের মাসি জয়ার বাড়িতে এসেছে। আর আলাপ করতে লাগলো জয়ার বাবা-মার সাথে। জয়া নিজেকে সামলে নিয়ে আলাপে অংশ নিতে যাছে এমন সময় প্রিতমের মাসি বলতে শুরু করল প্রিতমকে একই গ্রামের মেয়ের সাথে বিয়ে দিব না– অন্য গ্রামের মেয়ে ঠিক করেছি। তাই ভাল হবে না জয়া? সেই মুহূর্তে মোবাইল বেজে ওঠে-জয়া ফোন রিসিভ করেছে কিন্তু কোন কথা বলল না। প্রিতম: হ্যালো জয়া, কেমন আছ? আমার সাথে কেন এইরকম করছ? অনেক দিন ধরে ফোন দিচ্ছি রিসিভ করছ না। কাল তোমার সাথে দেখা করব এই বলে ফোন কেটে দিল জয়া। পর দিন ঠিক সময় চলে এল জয়া। জয়াকে দেখে প্রিতম চমকে গেল। আজ জয়াকে দেখতে দারুণ লাগছে। জয়া প্রিতমের কিনে দেওয়া ড্রেসটি পরে এসেছে তাই। জয়া প্রিতমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বললো-আমাকে ক্ষমা কর প্রিতম, আমি আার তোমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই না। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর কষ্ট দিব না। সেই কষ্টের হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম। যেখানে খুশী সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধতে পার। তবে তোমার জন্য আমার মনের দরজা সবসময় খোলা থাকবে। প্রিতম:জয়া তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে চাই না। আমি জানি তোমাকে ছাড়া আামি কারো সাথে সুখি হব না। জয়া এবার প্রিতমকে বোঝাল দেখ, সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে ভাবতে পারি না। বুঝতে চেষ্টা কর এমনত হতে পারে আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখি নাও হতে পারো। তাছাড়া তোমার বাবা-মা কষ্ট পাবে। তুমি তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে কর এবং সেই মেয়েটি তোমাকে খুব ভালবাসবে। তাই বলে ভেব না আামি তোমাকে ভালবাসি না। তোমাকে গ্রহণ করতে আমার ভয়। আর জান এটাই প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা কারণ ভালবাসা সবই পারে। আবারও বলি তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি সারাজীবন তোমার সুখের জন্য প্রার্থনা করব। আমার হৃদয়ে তোমার জন্য ভালবাসা চিরদিন থাকবে। আসলে জয়া অন্যের সুখের জন্য করল। সেই চিন্তা করল আমি প্রিতমকে এই মুখ আর দেখাব না। তাই সে তাদের বিয়ের আগে দূরে জায়গা চলে গেল এবং এখন পর্যন্ত সে বিয়ে করেনি। ভালবাসার মানুষ যতই খারাপই হোক না কেন তার মঙ্গল কামনা করাই প্রকৃত ভালবাসার অর্থ॥ ❑

এক অদ্ভুত বৃক্ষ

ইনোসেন্ট ভোর এলেক্স

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই বন্ধু-বান্ধব থাকে। মানুষে-মানুষে যে বন্ধুত্ব হয়, এটা স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি মানুষের সাথে অন্যান্য জীব-জন্তুতেও বন্ধুত্ব আছে। মানুষের এমনও এক বন্ধু আছে, যে মানুষকে কখনই অপকার করে না। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কে সেই বন্ধু? হ্যাঁ, সে হলো আমাদের পরম বন্ধু গাছ। যে আমাদের সকল কাজে সহায়তা করে। বিশেষত, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। আমাদের পরিবেশ ঠাণ্ডা রাখে। আমাদের খাবার জন্য ফলমূলসহ অনেক কিছুই দেয়। এভাবেই গাছ আমাদের সব সময় সাহায্য করে। কিন্তু সেই গাছ যদি আমাদের শত্রু হয়ে আমাদের অপকার করতো, তাহলে কী হতো? পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে একাকার হয়ে যেত। ঠিক তেমনই এক গাছ আছে। গাছটির নাম শঙ্খ গাছ, গাছটি নড়াচড়া করতে পারে। গাছটির সম্পর্কে সবাই কম-বেশি জানে।

টুটুল নামে এক ছেলে আছে। তার বয়স ১০ বছর। তার মা-বাবাকে সে একদিন সেই শঙ্খ গাছ সম্পর্কে জানতে চাইলো। মা বললো, গাছটি খুবই শক্তিশালী। গাছটি আফ্রিকার আমাজন জঙ্গলে অবস্থিত। এক বাদুর কাঠাবাদাম খেতে গিয়েছিল। তখন, সবগুলো কাঠবাদামের মধ্যে একটি কাঠবাদাম জ্বলজ্বল করছিলো। বাদুর বাদামটি মুখে নিয়ে চাবানো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে পড়ে গেল। বাদুরটির শরীর তখন এমন ভারী হয়ে গেল যে, সে মাটির নিচে ডেবে গেল। তারপর মাটির নিচে তার শরীর ফুলে-ফেঁপে-ফেটে এমন একটি গাছ হয়ে গেল যে, সেই গাছের সংস্পর্শে যে সমস্ত জীব-জন্তু, পোকামাকড়, জড় পদার্থ, এমনকি মানুষ পর্যন্ত গেলে আর ফিরে আসতে পারতো না। সব মানুষ চলে যেতো শঙ্খ গাছের পেটে।

টুটুল কথাটি শুনে একটুও ভয় পেলো না। সে বললো যে এটি শুনতে তার অনেক ভালো লেগেছে। মা তো তাকে ধমক দিয়ে বললো, পাগল ছেলে নাকি? তোর একটুও ভয় পেলো না? বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী, সাহসী মানুষজন পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছে, আর তুই নাকি ভয় পাচ্ছিস না। টুটুল ভাবে, "মাকে আর বলে লাভ হবে না। মা তো দেখি আমার মনে জোর করে ভয় ঢোকাবে। আমারই কিছু না কিছু করতেই হবে"। মা এ ও বলছে যে, গাছটি প্রায় ৫০০০ এর মতো মানুষ গিলে খেয়েছে। টুটুলের বয়স যখন ১১, তখন বৃক্ষটি প্রায় ৮০০০ এর মতো মানুষ গিলেছে।

টুটুল একদিন ওর ৫ বন্ধুর সঙ্গে ওই শঙ্খ গাছের সম্পর্কে আলাপ করে। আলাপ করার পর সব বন্ধুরা খুব উৎসাহবোধ করে এবং গাছটি দেখার জন্য রাজি হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত হয় সবাই আজই বের হবে। সবাই ভাবছে যে, মা-বাবাকে মিথ্যা বলবে কী করে? মিথ্যা বলা যে মহাপাপ! দুপুরে যখন মা-বাবা

একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, ঠিক সেই সময় ছয়জন বাড়ির নিস্তব্ধতায় পালিয়ে যায়। ছয়জনের মা বাবারই একই অবস্থা।

কথা অনুযায়ী টুটুলরা সবাই জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে যায়। অ্যামাজন জঙ্গল আফ্রিকায় অবস্থিত, কাজেই হেঁটে পৌছানো সম্ভব নয়। তবুও টুটুলরা রওনা হলো। কিছুদূর হেঁটে যাবার পর তাদের পায়ের গতি এমন দ্রুত হয়ে গেল যে, ২০ কিলোমিটার দূরত্ব পথ ১ সেকেন্ডে পার হওয়া যায়। টুটুলরা খুবই তাড়াতাড়ি আমাজন এ পৌঁছলো। জঙ্গলের গভীরে চলে যায় তারা। কিন্তু সেই গাছটিকে খুঁজে পাচ্ছিল না তারা। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর হঠাৎ পেছন থেকে গররর-গররর শব্দ শুনতে পায় টুটুলরা। ৬ বন্ধুই এক জায়গায় ছিল। গররর-গররর শব্দ শুনতে পেয়ে তারা পিছিয়ে গেল। তারা একসময় পেছনে তাকায়, আর ছয়জনই জোরে আ-আ করে চিৎকার করা শুরু করে। প্রায় দুই মিনিট ধরে তারা চিৎকার করেই যাচ্ছিল। কারণ তারা গাছটিকে দেখে ফেলেছে। গাছটিও গর্জন করছিল তাদের সঙ্গে। ছয়জনের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে গেল।

গাছটি ওর মুখ থেকে শিকরের মতো কী জানি বের করে এক বন্ধুকে টানছিলো। টুটুলরা ওর বন্ধুকে টেনে বের করতে গিয়ে গাছটির জিহ্বা ছিড়ে এসেছিল। গাছটি তখন আরো জোরে গর্জন করলো। বন্ধুটি ভয়ে কেঁদে ফেলল।

বলছিল, "আমি মায়ের কাছে যাবো"।

ওরা সবাই গাছটির কাছে সাবধানে গেলো। গাছটিকে টুটুল সাহস করে ধরলো, গাছটি চুপচাপ হয়ে গেল। এরপর টুটুলকে দেখে ওর বন্ধুরাও গাছটিকে ধরল। গাছটি চুপচাপ হয়েই থাকলো। টুটুল গাছটিকে বললো, "তোমার কী হয়েছে? তুমি কেন মানুষদেরকে গিলে খাচ্ছো?" গাছটি কোন কথা না বলে সবাইকে গিলে ফেললো। টুটুলরা ওর ভিতরে গিয়ে দেখে যে হাজার হাজার মানুষ সেখানে কি জানি করছে। কেউ মারা যায় নাই। সবাই জীবিত। সবাই কী যেন করছিল। একজনকে টুটুল জিজ্ঞেস করলো যে কী হচ্ছে? লোকটি বললো, গাছটি বাঁদুর থেকে গাছ হয়েছে। এই কাজটি করলে সে আবার থেকে বাঁদুর হয়ে যাবে। টুটুলরা দেখলো একটা চকচকে ভাসমান সোনালি রঙের বস্তু, বস্তুটিকে মাটিতে বসাতে পারলেই গাছটি আবার বাঁদুর হয়ে যাবে। বস্তুটি এতো ভারী যে, ১০০ কোটি কেজি পাথর উঠাতে গেলে যেরকম কষ্ট হয় তার দ্বিগুণ। কিন্তু এ যে নিচে নামাতে হবে। তাও এতো কষ্ট হলে কীভাবে হবে?

একসময় টুটুলের মাথায় বুদ্ধি এলো। তা হলো, এখানে যতজন মানুষ আছে, সবাই যদি লাফিয়ে পড়ি বস্তুটির উপর, তাহলে কাজ হতে পারে। তাই হলো। সকল মানুষ লাফিয়ে পড়ার পর বস্তুটি মাটিতে বসে গেল এবং গাছটি সবাইকে থু থু করে বের করে দিল। টুটুলরা একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। এরপর গাছটি ঠাশ করে ফেটে আবার বাদুর হয়ে গেল। বাদুরটি সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলে উড়ে চলে গেল।

শঙ্খ গাছ দেখা তাদের শেষ হলো। এবার তো বাড়ি ফেরার সময় হলো তাদের। এবারো ওদের পা আগের মতো দ্রুত হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলো। সবাই বাড়ি গিয়ে দেখে যে, বাড়িতে কেউ নেই। কারণ সবার মা-বাবা বাইরে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর সবাই চলে এলো। টিভি নিউজে এবং খবরের কাগজে টুটুলদের সাহসিকতার কথা ছাপানো শুরু করলো। ৬ বন্ধু মিলে এক দারুণ কাজ করলো। তারা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে অনেক আদর পেলো॥ ❑

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন ১৩ জন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৭) কার্ডিনাল মনোনীত বিশপ কর্নেলিয়াস শিম ব্রুনাই এ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের ড্যান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আমেরিকার ওহিও'র স্তেউবেনভিল্লের ফ্রান্সিসকান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশতত্ত্বে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। ব্রুনাইয়ের বিভিন্ন স্থানে সহকারী পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন তিনি এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রুনাই এর ভিকার জেনারেল নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর তিনি এপস্টলিক প্রিফেক্ট হন এবং ২০ অক্টোবর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পল ব্রুনাইকে এপস্টলিক ভিকারিয়েটের মর্যাদা দিলে বিশপ কর্নেলিয়াস শিম ব্রুনাই এর প্রথম এপস্টলিক ভিকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

৮) কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ পাউলো লোজোদিচে রোমে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে যাজক পদ লাভ করেন। তিনি ঐশতত্ত্বে লাইসেন্সিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। সহকারী পুরোহিত, পালক পুরোহিত, আধ্যাত্মিক পরিচালকসহ বিভিন্ন পালকীয় সেবাদায়িত্ব পালন করেন তিনি। ইতালিয়ান বিশপ সম্মিলনীর অভিবাসী বিষয়ক কমিশনের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে আলবা মারিত্তিমার নামধারী বিশপ হন তিনি এবং ৬ মে ২০১৯ সিয়েনার আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত হন।

৯) কার্ডিনাল মনোনীত ফাদার মাওরো গামবেত্তি ওএফএম ইতালির বলোনিয়ার সান পিয়েত্ত র্তেমেতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিখ্যাত বলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশুনা করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘে প্রবেশ করেন এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দে যাজক হন। উত্তর ইতালির এমিলিয়া-রোমাজ্ঞীয়াতে বিভিন্ন সেবাদায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত প্রভিন্সে ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘের প্রভিন্সিয়াল হন এবং একই সাথে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পবিত্র কনভেন্টের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

১০) কার্ডিনাল মনোনীত বিশপ এসকুইভেল ১ মে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকোর চিলতেপেক এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্পেনের তোলোকা সেমিনারীতে দর্শন ও ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা করে পন্টিফিক্যাল সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশতত্ত্বে লাইসেন্সিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ২৫ আগস্ট তিনি যাজক হন এবং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি তাপাচুলার বিশপ নিযুক্ত হন এবং এই সময়ে তিনি সেলামের সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। সাধু পোপ ২য় জন পল ৩১ মার্চ ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তাকে খ্রিস্তোবালের বিশপ হিসেবে নিযুক্ত করেন।

১১) কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ সিলভানো এম, তোমাসি ১২ অক্টোবর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইতালির কাসোনি দি মুসোলেন্তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইতালি এবং আমেরিকায় পড়াশুনা করেন এবং ৩১ মে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। তিনি নিউইয়র্কের ফরধাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৩-৮৭ পর্যন্ত তিনি আমেরিকার বিশপ সম্মিলনীর অভিবাসী ও উদ্বাস্তদের যত্ন বিষয়ক পালকীয় সেবার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৯-৯৬ পর্যন্ত অভিবাসী ও উদ্বাস্তদের যত্ন বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিলে সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ইথুপিয়া, এরিত্তেয়া, আফ্রিকান ইউনিয়ন, জোবুতি ও জাতিসংঘে পোপের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল পোপ ফ্রান্সিস আর্চবিশপ তামোসিকে পোপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন।

১২) কার্ডিনাল মনোনীত ফাদার রানিয়েরো কান্তালামেস্সা (কাপুচিনো) ইতালির আস্কলির পিচেনোতে ২২ জুলাই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে যাজক হন। তিনি ঐশতত্ত্ব ও ক্লাসিকাল সাহিত্যে ডক্টরেট। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে পেন্টিকোস্টাল চার্চের সাথে সংলাপেও বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপনার জগৎ ছেড়ে প্রচারে নামেন। পোপীয়গৃহের প্রচারক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। পোপ ২য় জন পল, পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট ও পোপ ফ্রান্সিসও তাকে একই দায়িত্ব দান করেন। বহু ভাষাবিদ এই ফাদার বিভিন্ন ভাষায় বেশ কিছু বই প্রকাশ করেন।

১৩) কার্ডিনাল মনোনীত মন্সিনিয়র এনরিকো ফেরোচি ২৭ আগস্ট ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইতালির পিজ্জলিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে রোমে সেমি-নারীতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে অভিষিক্ত হন। তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের চ্যাপলেইনের দায়িত্ব পান। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে রোমের কার্ডিনাল ভিকার তাকে ডিভাইন আমোর তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন॥

- তথ্যসূত্র : news.va, ডয়েচে ভেলে

ভিয়েনাতে সহিংস হামলা প্রসঙ্গে পোপ মহোদয়
যথেষ্ট সহিংসতা হয়েছে; শুধু ভালবাসাই পারে ঘৃণাকে দূর করতে

গত সোমবার (০৩/১১) রাত আটটা নাগাদ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার একটি সিনাগগের সামনে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়ে সন্ত্রাসীরা ৪ জনকে হত্যাসহ আরো ১৫জনকে গুরুতর আহত করেছে। অস্ট্রিয়া পুলিশের এক সূত্র জানায়, সিনাগগের পাহারায় থাকা একজন পুলিশ অফিসার মারা গেছেন। অন্যদিকে পুলিশের গুলিতে একজন হামলাকারীও মারা গেছে। হামলাকারীদের খোঁজে বের করতে অস্ট্রিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্রে চিরুনি অভিযান চলছে। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানীসহ বিশ্বের অনেক দেশের সরকার প্রধানগণ এই জঘন্য কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এদিকে পোপ ফ্রান্সিস এই হামলার শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে-সাথে অস্ট্রিয়াবাসী সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিনের স্বাক্ষরে এক টেলিগ্রাফ বার্তায় পোপ মহোদয় হামলায় ক্ষত-বিক্ষত ব্যক্তিদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। পোপ ফ্রান্সিস ক্ষতিগ্রস্তদের ঈশ্বরের দয়াতে রেখে সহিংসতা ও ঘৃণা দূর করতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি করতে ঈশ্বরের আশির্বাদ কামনা করেন। পোপ মহোদয় টুইট করেও সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তার দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদেও জন্য বিশেষ প্রার্থনার আশ্বাস দান করেন॥

প্রয়াত ফাদার রিচার্ড টিম সিএসসি-এর নাগরিক স্মরণ সভা

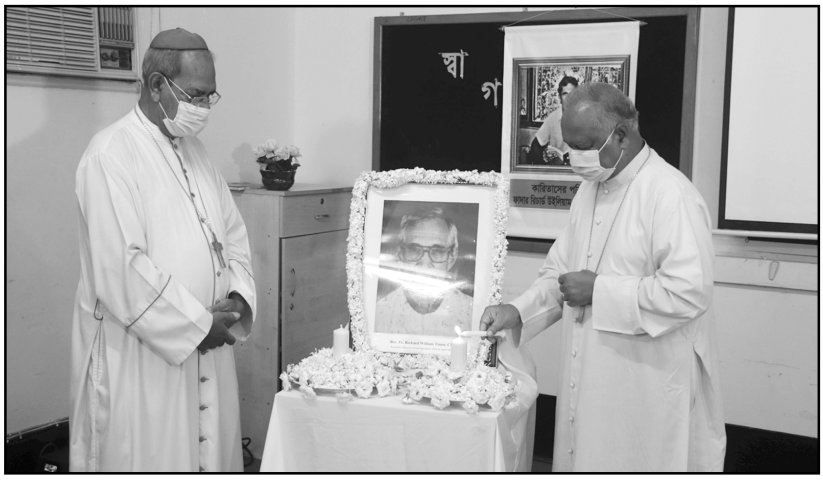

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▌ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুর্নগঠন এবং বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবে ফাদার টিমকে এদেশের মানুষ চিরদিন স্মরণে রাখবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেও ভোগ-বিলাসিতা ত্যাগ করে বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে ও আর্তমানবতার সেবায় ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন মানবতাবাদী এই ব্যক্তিত্ব। নটর ডেম কলেজের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কলেজটির অন্যতম এই প্রতিষ্ঠাতা। তার হাত ধরেই কলেজটিতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয় এবং ১৯৫৫ সালে তিনি নটর ডেম কলেজ সায়েন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কলেজটির ডিবেটিং ক্লাব ও নটর ডেম কলেজ অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, প্রাণিবিদ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় কর্মী, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরিতে কাজ করা বাংলাদেশের এই অকৃত্রিম বন্ধু। কারিতাস বাংলাদেশের দ্বিতীয় নির্বাহী পরিচালক ফাদার টিম-এর প্রয়াণ উপলক্ষে অক্টোবর ২৩, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাগরিক স্মরণ সভায় বক্তাগণ এসব কথা বলেন।

কারিতাস বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ড. ফাদার হিউবার্ট লিটন গমেজ সিএসসি'র প্রার্থনা এবং নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও-এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ স্মরণ সভায় স্মৃতিকথা ও অনুভূতি প্রকাশ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসিসহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও বলেন, "ফাদার টিম বেঁচে আছেন। তিনি অমর, তার চিন্তায়, তার কথায়, তার কাজে।" মাননীয় সংসদ সদস্য ও নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট মিজ্ আরমা দত্ত বলেন, "ফাদার টিম ছিলেন আমাদের উন্নয়নধারার প্রবর্তক। উনি ছিলেন বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার স্রষ্টা।" কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কারিতাসের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, আইপিডিএস সভাপতি সঞ্জিব দ্রং, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ফাদার প্যাট্রিক গ্যাফনি সিএসসি স্মৃতিচারণ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ফাদার টিম-এর বর্ণ্যাঢ্য কর্মময় জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন।

এ মহতি অনুষ্ঠানের সমাপনী লগ্নে কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলেন, "ফাদার টিম বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা করেছেন। নিস্বার্থভাবে তিনি সেবা করেছেন গ্রামে-গঞ্জে-জনপদে।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের অতুলনীয় ক্ষতি সাধিত হয় এই সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য তিনি নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ছয় মাসের জন্য ফাদার টিম মনপুরা দ্বীপে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে International Understanding ও বাংলাদেশের উন্নয়নে দীর্ঘ ৩৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ফাদার টিম ম্যাগসায়সায় পুরস্কারে ভূষিত হন। একই বছর সমাজ সেবায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করায় তিনি আবু সাইয়ীদ চৌধুরী পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি বাংলাদেশের মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর পর তিনবার এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি South Asian Forum for Human Rights প্রতিষ্ঠা করেন ও আহ্বায়কের কাজ করেন। ২০০০ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ফাদার টিম বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেন। তার এ সময়কার বিশেষ বিশেষ কাজগুলো ছিল: আদিবাসীদের অধিকার ও উন্নয়ন, দরিদ্র ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারিতাস বাংলাদেশের পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত হন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে ভাতিকান পন্টিফিকাল কাউন্সিল ফর জাস্টিস এ্যান্ড পিস বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লেখক, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, এবং মানবাধিকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাকে "মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা" প্রদান করেন॥

ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় ভ্রাতৃসংঘের যাজকদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান

ফাদার কল্লোল রোজারিও ▮ গত ২৬ অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যা থেকে ২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চার দিনব্যাপী ঢাকা আর্চবিশপ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় ভ্রাতৃসংঘের যাজকদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান। এতে ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি ও বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজসহ মোট ৪৮জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও একজন ডিকন অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিনে ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ও বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সভাপতি ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং সবাইকে সক্রিয়ভাবে নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ বলেন, তিনি শুধুমাত্র নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন এবং সেই সাথে সকলকে নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজও সবাইকে সুন্দরভাবে অংশগ্রহণ করতে আহবান করেন। চারদিনের সহভাগিতার মূল বিষয় ছিল- 'যাজকত্ব, খ্রিস্টের যাজকত্ব ও আমাদের যাজকত্ব, আধ্যাত্মিকতা এবং খ্রিস্টের অন্তরঙ্গতা ও তাঁর প্রৈরিতিক কাজ।' যিশু খ্রিস্ট কিভাবে পুত্রত্ব লাভ করেছেন, যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারে কিভাবে দেখানো হয়েছে তা সহভাগিতা করেন নির্জন ধ্যান পরিচালক বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি।

প্রথম দিন বাইবেলের আলোকে এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর ক্রমবিবর্তন ধারায় সুন্দরভাবে যাজকত্বের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, যাজকত্ব হল ঈশ্বরের মহাদান। যাজক পুরো অর্থাৎ অগ্রভাগে থেকে মানুষের কল্যাণ করেন। যাজক যজ্ঞ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে নিজে পবিত্র হন এবং অন্যদেরও পবিত্র করেন। নতুন নিয়মে যাজকত্বকে কিভাবে দেখানো হয়েছে সে বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া সাক্রামেন্তের গুরুত্বের প্রতিও তিনি আলোকপাত করেন। উপদেশে বিশপ থিয়োটনিয়াস বাইবেল ও প্রতিদিনের বাণীর আলোকে গভীর জ্ঞানময়, বাস্তবধর্মী সহভাগিতা করেন। তাছাড়া প্রাহরিক প্রার্থনা, পবিত্র জপমালা প্রার্থনা, পবিত্র আরাধনা, পাপস্বীকার এবং ব্যক্তিগতভাবে ধ্যানের সুযোগ ছিল। শেষ দিন বিকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। উপদেশে তিনি বলেন, যাজকত্বে যে সৌন্দর্য রয়েছে, সেই সৌন্দর্য আমরা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অটুট রাখি। সেই সৌন্দর্য দিয়ে অন্যদের সেবা করি। যিশু যেমন মানুষকে ভালবেসেছেন, আমরাও যেন তেমনি মানুষকে ভালবাসি। সাধু পল তার পত্রের মধ্যদিয়ে যিশুর ক্রুশীয় যন্ত্রণা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে প্রকাশ করেছেন। যিশু নিজেই হলেন মেষ, বেদী, নৈবেদ্য এবং যজ্ঞ উৎসর্গকারী। আমরা যিশুর যাজকত্বে যেন সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করি। অনেক সময় আমাদের ভক্তির চেয়ে জনগণের ভক্তির ভাব বেশি থাকে। আমরা যেন সবসময় আমাদের ভক্তির ভাব বজায় রাখতে পারি এবং উপাসনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি।

ঢাকা ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সভাপতি ফাদার যাকোব নির্জন ধ্যান পরিচালককে সহভাগিতা করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, আমরা পেয়েছি, হয়েছি আর এখন আমাদের দেওয়ার সময়। আমরা যেন যাজক হিসেবে আমাদের সেবাকাজে আরও উজার করে বিলিয়ে দেই। এছাড়াও, আগত ফাদারদেরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং যারা বিশপস্ হাউজে অবস্থানরত প্রত্যেককে তাদের সেবাদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় এই নির্জন ধ্যানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফ্যামিলি রোজারি মিনিস্ট্রি অনুষ্ঠান

মনিষা ফ্লোরেন্স গমেজ ▮ "এসো রোজারিমালা প্রার্থনা করি, কুমারী মারীয়ার আদর্শে জীবন গড়ি" এই মূলসুরের উপর গত ১৬-১৭ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্র-শনিবার সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে 'রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় ফ্যামিলি রোজারি মিনিস্ট্রি' এর আয়োজনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে হাইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ১৩০জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ১৬ অক্টোবর, বিকাল ৪টায় ধর্মপল্লীর মা মারীয়ার গ্রটোর সামনে রোজারিমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৭ অক্টোবর সকাল ৯টায়

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় ফ্যামিলি রোজারি মিনিস্ট্রির পরিচালক ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন এবং সিস্টার সেলিন হেলেন গমেজের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম। মূলসুরের ওপর প্রাণবন্ত উপস্থাপনা রাখেন ফাদার প্রশান্ত আইন্দ। পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা সম্প্রতি প্রকাশিত তার "প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা" বই এর আলোকে মা মারীয়ার বিষয়ে সহভাগিতা করেন। দুপুর ১২:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

শিশুমঙ্গল সেমিনার

চন্দ্রা গমেজ: ২৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ "আমরা যিশুর সেবক সকলে" এই মূলসুরের ওপর শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে অর্ধদিবসব্যাপী শিশুমঙ্গল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচী। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী মনিক এসএমআরএ সেমিনারের মূলভাবের ওপর প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কর্মশালা ২০২০-এর আলোকে ধর্মপল্লী কর্তৃক গৃহিত ৪টি অগ্রাধিকারসহ আরো কয়েকটি সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের ওপর গ্রামভিত্তিক ৭টি নাটিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি শিশুদের অংশগ্রহণে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কণ ও চারু-কারুকলা প্রদর্শনী। শিশু ও পরিচালিকাদের পুরস্কার প্রদান ও দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনার সমাপ্ত হয়। উক্ত সেমিনারে ১২০ জন শিশু ও ১৬জন পরিচালিকা উপস্থিত ছিলেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

ওয়েলকাম লম্বা ▮ গত ১১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ জাফলং ধর্মপল্লীতে ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই'কে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ১জন বিশপ, ২জন ফাদার, ২ জন সিস্টারসহ মোট ৮০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকার মনোনীত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। উপদেশবাণী রাখেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগের পর ফাদারকে ফুল ও গানের মধ্যদিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। যোশুয়া খৎস্লিং, জাফলং ধর্মপল্লীর রাংবা বালাং ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিশপ মহোদয় আমাদের অনেক যত্ন নিয়েছেন, সময় দিয়েছেন এবং মেষপালক হিসেবে সবসময় রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনাতে সুন্দরভাবে পথ চলেছি। বিশপ বিজয় বলেন, তাকে যখন যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তিনি আনন্দ মনে গ্রহণ করেছেন। আবার যখন খুলনা থেকে সিলেটের দায়িত্ব দেয়া হয় তাও তিনি গ্রহণ করেছেন। নতুন ধর্মপ্রদেশে হিসেবে তিনি যতটুকু সম্ভব ছিল তা করতে চেষ্টা করেছেন। ওয়েলকাম লম্বা বলেন, বিশপ মহোদয়ের মাধ্যমে সিলেট ধর্মপ্রদেশে উন্নয়নের গতি এবং একটি ধারা শুরু হয়েছে। পরবর্তী বিশপ এসে আশা করি সেই ধারা অব্যাহত রাখবেন। এরপর, বিশপকে মানপত্র, ক্রেস্ট ও ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করা হয়। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা বলেন, বিশপ মহোদয় হলেন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী মানুষ। তার ছত্রছায়া থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। তিনি উদার, আন্তরিক এবং যত্নশীল একজন পিতা। তিনি তার মেষদের সবসময় যত্ন নিয়েছেন। একই সাথে তিনি বিশপ মহোদয়, ফাদার, সিস্টারগণ এবং যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। উক্ত অনুষ্ঠান দুপুর ১২টায় সমাপ্ত হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় জাফলং ধর্মপল্লীর খ্রিস্টান বাষিক ঋণদান সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা। বিকাল ৩টায় দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে এই সভার সমাপ্তি ঘটে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 55/14)

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বেলা ২:৩০ মিনিটে সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর অর্ধদিবসব্যাপী ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে দুপুর ১২টা হতে। সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের নিজ-নিজ পাশবহি/সমিতির আইডি কার্ড ও এজিএম বিজ্ঞপ্তি সঙ্গে নিয়ে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে উপস্থিতি রেজিষ্টারে স্বাক্ষর পূর্বক সভায় অংশগ্রহণ করে সভাকে সুষ্ঠু, সার্থক ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে

সুমন রোজারিও
চেয়ারম্যান

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ খ্রিস্টাব্দে ও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার/ঋণ খেলাপী/অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার পূর্বে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন, কোরাম-পূর্তি লটারীতে কেবলমাত্র তাদের নামই অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তাদের প্রত্যেককে কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান করা হবে।

অনুলিপি:

১. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ উপজেলা।
২. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর জেলা।
৩. সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা বিভাগ।
৩. দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কালব্)।
৪. অফিস কপি।

বিজ্ঞ/১১০/২০২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 41
Regd. No. DA-33
❖ 8 - 14 November, 2020, ২৪ - ৩০ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরী না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরী নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**